রাতের কলকাতা

শ্রীমেঘনাদ গুপ্ত প্রণীত

মূল্য ১।০

রাতের কলকাতা

শ্রীমেঘনাদ গুপ্ত প্রণীত

মূল্য ১৷০

প্রস্তাবনা

"রাতের কল্‌কাতা" কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্যে লিখিত হোলো।

সেকেলে কল্‌কাতার দৃশ্য আছে "হুতোম-প্যাঁচার নক্সায়"। আমাদের এ বইখানিও নক্সা এবং এতে আছে একেলে কল্‌কাতার সময়-বিশেষের ছবি। আমার তুলিতে হুতোমের মতন তেমন পাকা রং নেই, লোকের ভালো না লাগাই সম্ভব। ভরসা খালি এইটুকু যে, দুধ না পেলে অনেকে ঘোল খেতেও রাজি আছেন।

আর কিছু না হোক্, এই নক্সা অনেকেরই ছানি-পড়া চোখে অব্যর্থ ঔষধের কাজ করবে। কল্‌কাতার রাত্রি-রহস্য সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি যার-পর-নাই ঝাপ্‌সা। "রাতের কল্‌কাতা" তাঁদের চোখ সাফ ক'রে দেবে। ছেলে-মেয়ের বাপরা বুঝবেন, আসল বিপদ কি এবং কোন্‌খানে? তাঁদেরই অসাবধানতায় কুসংসর্গে প'ড়ে অপ্রাপ্তবয়স্করা নরকে আসা-যাওয়া করবার সুযোগ পায়।

তবু আমি সম্পূর্ণ ছবি দিই নি। ছবির সবটা আঁক্‌তেও পারতুম, কিন্তু সে সম্পূর্ণতা এমন কল্পনাতীতরূপে ভয়ানক যে, আঁক্‌তে প্রবৃত্তি হোলো না। অল্প যেটুকু দেখিয়েছি, তাইই হয়তো নীতি বাগীশের ধাতে সহ্য হবে না। কি করব, উপায় নেই, আরো রেখে ঢেকে বলা অসম্ভব। এ শ্রেণীর নক্সা এর চেয়ে শিষ্ট ভাবে ও শ্লীল ভাষায় লেখা চলে না। তবু আমি হুতোমের চেয়ে সবদিকেই—কি ভাষায় আর কি বিষয়ে—ঢের বেশী সাবধান হয়েছি। আমাকে স্থানীয় আবহাওয়া ফোটাবার জন্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্য কথা ব্যবহার করতে ও নরকের পর্দা তুল্‌তে হয়েছে এবং স্থানে অল্পস্বল্প স্থানে আদিরসকেও একেবারে পরিহার করতে পারিনি, কিন্তু

এ-রকম গ্রাম্য কথা, নরকের দৃশ্য ও আদিরস একালকার উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যের মধ্যেও যথেষ্ট আছে—অধিকন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকরা আমার চেয়েও ঢের বেশী অগ্রসর হয়েছেন। আজকালকার থিয়েটারী নাট্যগুলির তুলনায় "রাতের কলকাতা" যে বাইবেলের মত পবিত্র, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা! পাঠক লক্ষ্য করলে আরো দেখ্‌বেন যে, পাপকে আমি পাপ ব'লেই বরাবর চিনিয়ে দিয়েছি, তার প্রতি সকলের ঘৃণা ও বিরক্তি আকর্ষণেরই চেষ্টা করেছি, আধুনিক অনেক উপন্যাসের মত পাপের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি উৎপাদনের প্রয়াস এ পুস্তকের কোথাও নেই। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "রাতের কল্‌কাতা"কে একজন পাঠকও অশ্লীল ব'লে ভাবতে পারবেন না। এ পুস্তকের কোথাও অন্যায়রূপে অশ্লীলতার সমাবেশে পাঠকের মনকে উত্তেজিত করবার চেষ্টামাত্র নেই।

যে-সব ব্যাপার এতে আছে, তার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখেই লেখা হয়েছে। শোনা কথায় নির্ভর কর্‌লে আরো অনেক ব্যাপার লেখা যেত, কিন্তু আমি তা করিনি। আমি গোয়েন্দার মত পথে পথে ঘুরে এই সব বিবরণ সংগ্রহ করেছি এবং গণিকা-পল্লীর উপাদান সংগ্রহে অনেক প্রথম শ্রেণীর 'বিশেষজ্ঞে'রও সাহায্য পেয়েছি! পাঠকদের মধ্যেও যদি পাঠকদের মধ্যেও যদি কোন বিশেষজ্ঞ থাকেন, আশা করি তিনি বিচার ক'রে দেখবেন যে, আমার পরিচিত 'বিশেষজ্ঞ'দের দেওয়া উপাদানগুলি নির্ভরযোগ্য কি না! এখনো অগুন্তি উপাদান আমার হাতে রইল—যার মধ্যে কল্‌কাতার আরো ঢের বিশেষত্ব আছে। পাঠক-সমাজে আগ্রহের সাড়া পেলে সেগুলি নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আবার দেখা দেব। নইলে এইখানেই ইতি।

মেঘনাদ গুপ্ত

রাতের কল্‌কাতা

প্রথম দৃশ্য

সহরের সাধারণ ছবি

কল্‌কাতা!—ব্রিটিস সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর, ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর, প্রাচ্যের প্যারি, সর্ব্ব-জাতির মিলন-ক্ষেত্র, বাঙালীর গর্ব্বের নিধি, নব-সভ্যতার জন্ম-পীঠ, প্রাসাদাকীর্ণ কল্‌কাতা! দিবারাত্র তার পথে পথে জনতার স্রোত বইছে; মান্ধাতার পাল্কী, গরুর-গাড়ী আর মানুষগাড়ীর পাশে পাশে পরম আধুনিক বৈদ্যুতিক ট্রাম, 'বাস' ও মোটর-গাড়ী ছুটছে এবং তার দেহে ছায়া ফেলে আকাশে উড়ছে উড়োজাহাজ; চশমা-নাকে, লপেটা-পায়ে, টেরি মাথায়, ছড়ি-হাতে কাপুড়ে বাবু, কালো অঙ্গে ফিট্‌ফাট্ বিলাতী পোষাকে 'ইঙ্গ-বঙ্গ'-পুঙ্গব, নানান অদ্ভুত আকারের টুপী আর হরেক রকমের জামাকাপড় প'রে পার্সী, গুজরাটি, মারাঠী, শিখ, পাঠান, কাবুলী, নেপালী, ভুটানী, পাঞ্জাবী, চীনে ও মাড়োয়ারী প্রভৃতি নিখিল ভারতের মনুষ্য-নমুনা, ইংরেজ, স্কচ, আইরিস, ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির উগ্র মূর্ত্তি, আবার সেই সঙ্গে অর্দ্ধ-নগ্ন উড়িয়া আর পূর্ণ-নগ্ন নাগা সন্ন্যাসীর দল—মানবতার এমন অপূর্ব্ব জগা-খিচুড়ী পৃথিবীর আর কোথাও গেলে চোখে পড়্‌বে না! একদিকে বড় বড় রং-বেরঙের আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাশ্রেণী, তারই ছায়ায় ছায়ায় হেলে-পড়া, ঘুটে-দেওয়া মেটে-দেওয়াল অগণ্য কুঁড়ে ঘর—এ দৃশ্যও অন্যত্র দুর্লভ! রাজপথের একদিকে মূর্ত্তিমান্ ঐশ্বর্য্যের মত শকটারোহী, নির্ব্বিকার, সুসজ্জিত, জগতের দুঃখ-দারিদ্র্যে অচৈতন্য লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা এবং অন্যদিকে প্রকাশ্য রাস্তার ধূলায় ছেঁড়া কাঁথা পেতে চিরদারিদ্র্যের উপাসক, কোটরগত-চক্ষু, অস্থিচর্ম্মমাত্রসার

দীন ভিখারীর দল নাভি-শ্বাস টান্‌তে টান্‌তে মৃত্যুর অপেক্ষায় প'ড়ে আছে,— আবার তাদেরি স্তিমিত নেত্রের সাম্‌নে দিয়ে চলেছে সারে সারে সারে ঢাক-ঢোল-ভেঁপু বাজিয়ে, ফুলের গন্ধ বিলিয়ে, কোঁচানো চাদর উড়িয়ে নিশ্চিন্তপ্রাণ বরযাত্রীর দল,— নিয়তির এ হেন নির্দ্দয় পরিহাস-লীলা আর কোথায় গেলে দেখা যায়? জীবন ও মৃত্যু এখানে এক ডালের ফুল ও কাঁটার মত একত্রে বাস করে!

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কল্‌কাতার সম্বন্ধেই বলেছেন :—

"এই কলিকাতা—কালিকা-ক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত।
হিন্দুর কালী আছেন হেথায়, মুসলমানের মৌলা আলি,

চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুস্কিলাসান চেরাগ জ্বালি'।
সকল ধর্ম মিলেছে হেথায় সমন্বয়ের মন্ত্র-সুরে,
স্বাগত সাধক-ভক্ত-বৃন্দ মরতের বৈ-কুণ্ঠপুরে।"

বাস্তবিক, কল্‌কাতাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখ্‌লেই মনে হয়, এ নগর সাধুর তীর্থক্ষেত্র, ধার্ম্মিকের সাধন-নিকেতন, পবিত্রতার পুণ্য আশ্রম! হিন্দুর কালী, তারা, মহাদেব, শনি, জগদ্ধাত্রী, জগন্নাথ, শীতলার মন্দির, বৌদ্ধের বিহার, জৈনের পরেশনাথ দেবালয়, খ্রীশ্চানের গির্জ্জা, মুসলমানের মস্‌জিদ এর চারিদিকে নানা আদর্শের শিল্প-বিচিত্র মাথার পর মাথা তুলে আছে। প্রতি পদেই একটি না একটি মন্দির ও তার সাম্‌নে দলে দলে ভক্তের ভিড় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে! সকালে সন্ধ্যায় পূজার্চ্চনা, শঙ্খঘণ্টার রোল, ঝমাঝম দর্শনীর ধ্বনি! অধিকাংশ হিন্দু দেব-দেবীরই অবস্থা যে বেশ উন্নত, সেটা মন্দিরের মর্ম্মরমণ্ডিত সুচিকণ গৃহতল, দেব-দেবীর সমুজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কার ও সেবাইতদের আহারপুষ্ট নধর দেহগুলি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু বাইরেকার এই ধর্ম্মের তলায় কত যে অন্যায়, কত যে জঘন্যতা ও কত যে পাশবিকতা আত্মগোপন ক'রে আছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাক্‌লে কেউ তা দেখ্‌তে পাবে না! একদিকে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী ও আর-একদিকে কালীঘাটের কালিকাদেবী কল্‌কাতার ঘাঁটি আগলে থাকলে কি হবে, তাঁদের দিব্যদৃষ্টিতে ধূলিনিক্ষেপ ক'রে সয়তান তার শত পাপ-সঙ্গীকে নিয়ে, নিত্যই তো সহরের মধ্যে এসে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ছে!

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন:—

"এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী ছিল এ একদা বাঘের বাসা,
বাঘের মতন মানুষ যাহারা তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা!"

সেকালে এখানে যেমন বীরত্বে ও তেজে বাঘের মতন মানুষ ছিল, একালেও তেম্‌নি মানুষরূপী বাঘের অভাব কল্‌কাতার নেই। এই সব মানুষ-বাঘের দল এখন বরং বেশী ভারী হয়েছে। তবে এরা বীরত্বে বা তেজে

নয়—হিংসায় এবং পশুত্বেই বাঘের মতন। এই বাঘ-বাঘিনীর দল সারা কল্‌কাতায় ছড়িয়ে আছে, দিনে-দুপুরে দলে দলে তারা আমাদের মধ্যে বিচরণ করছে—শিকারের খোঁজে সর্ব্বদাই ওৎ পেতে অদৃশ্য মড়কের মত! আমরা তাদের চিনি না, তারা কিন্তু আমাদের নাড়ী-নক্ষত্রের সব খবর রাখে নখদর্পণে। রাত্রে যখন কল্‌কাতার বুকের উপরে প্রগাঢ় তিমিরের পর্দ্দা নেমে আসে, এই বাঘ-বাঘিনীরা তখন অতর্কিতে, নানা কৌশলে আমাদের আক্রমণ করে। বনের বাঘ চায় মানুষের রক্ত-মাংস, কিন্তু এরা চায় আমাদের আত্মার সারাংশ! আর, একবার যার আত্মা তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে, আর তার বাঁচোয়া নেই! পল্লীগ্রামের নিশ্চিন্ত-প্রাণ পিতামাতারা আপনাদের সুকুমারমতি সন্তানদের কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দেন—মানুষ হবার জন্যে। কিন্তু বাঘ-বাঘিনীর পাল্লায় প'ড়ে প্রায়ই তাদের মনুষ্যত্ব নিঃশেষে নিহত হয় এবং দেশে ফিরে যায় তারা এক-একটি আস্ত জানোয়ার বা ভূত হ'য়ে।

কল্‌কাতার বাইরের চাকচিক্য, শোভা-সৌন্দর্য্য, আলোক-হাস্য, ধর্ম্মের ভাণ, গির্জ্জা মন্দির-মস্‌জিদের জটলা দেখে কেউ যেন না ভোলেন। চেরাগের তলাতেই কত জমাট অন্ধকার আছে, আজ আমরা সেই গোপন দৃশ্যেরই কতক কতক খুলে দেখাব। আমরা সকলে সারাজীবন এই কল্‌কাতার কোলে ব'সে কাটিয়ে দি, এই কল্‌কাতার অঙ্কেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের লীলা, কল্‌কাতার বাসিন্দা ব'লে আমাদের মন গর্ব্বে ও গৌরবে স্ফীত, কিন্তু কল্‌কাতার যথার্থ স্বরূপ আমাদের মধ্যে কয়জনে দেখেছে? কল্‌কাতার এই দুর্গম ও ভয়াবহ প্রাসাদ-অরণ্যে, নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে কয়জন ভ্রমণ করবার সাহস রাখে? আমাদের আশেপাশে নিত্য কত 'রোম্যান্স', কত চিত্তোত্তেজক ঘটনা, কত বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তা দেখবার আগ্রহ কয়জনের আছে? সকালে খবরের কাগজের রিপোর্ট—তার মূল্য কতটুকু? মারাত্মক বিপদ মাথায় নিয়ে,

বারংবার গুণ্ডার ছুরি এড়িয়ে, 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র 'স্পিরিট' সার্থক করবার জন্যে একাকী আমি, একগাছা ছোট লাঠিমাত্র সম্বল ক'রে, সন্ধ্যা থেকে শেষ-রাত পর্য্যন্ত কল্‌কাতার পথে পথে নিশাচরের মত নিয়মিতরূপে ভ্রমণ করেছি,—দুর্নীতির ছোঁয়াচ্‌ লাগবার ভয় না রেখে অনেক অস্থান-কুস্থানে ঢুক্‌তেও ইতস্তত করি নি! আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সমস্ত এই ছোট পুস্তকে ধরবে না। তবে কতক কতক আভাস ও ইঙ্গিত দিয়ে যাব,—পাঠকদের ভালো লাগ্‌লে, ভবিষ্যতে কল্‌কাতার আরো নানা রূপ সবিস্তারে বর্ণনা করবার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কল্‌কাতার পথ

কল্‌কাতার ধূলিধূসর, ধূম্রমলিন ললাটের উপরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে আসছে। এই সন্ধ্যা থেকেই সুরু হয় কলকাতার আসল জীবন! দিনের বেলায় কল্‌কাতার জনতারণ্যে, কর্ম্ম-ব্যস্ততায় বা কেরাণীদের আনাগোনায় এমন কিছু দেখা যায় না, যাতে রহস্যের আভাস মাত্র আছে। সন্ধ্যা থেকেই রহস্যের সূচনা—বিশেষ ক'রে শনিবারের সন্ধ্যায়। পথে পথে তখন একে একে গ্যাসের আলো জ্ব'লে ওঠে, মাথার উপরকার স্তব্ধ আকাশের বুকে কালো রেখা কেটে প্যাঁচার ঝাঁক্‌ ঝট্‌পট্‌ ক'রে উড়ে যায় এবং অলি-গলির আনাচে-কানাচে অন্ধকার থেকে কালো কালো কুৎসিত মুখ উঁকিঝুঁকি মারতে সুরু করে! এখন সাধুর বিশ্রামের সময় এবং সয়তানের জাগরণের লগ্ন।

পথে এখন শ্রান্ত কেরাণীদের ক্লান্ত মুখ আর দেখা যাচ্ছে না এবং কল্‌কাতার যে-সব পথ দিনের বেলায় লোক আর গাড়ীর ভিড়ে শঙ্কিত

ও স্পন্দিত হয়ে ওঠে, সে পথগুলি এখন স্থির ও বিজন হয়ে আছে। রাত নয়টার পরে ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, হাইকোর্টের আশপাশের রাস্তা ও রাধাবাজার ও মুর্গীহাটা প্রভৃতি পল্লীতে গেলে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। আরো একটু রাত হ'লে এ অঞ্চলে চল্‌তে গেলে গা ছম্ ছম্ করে ও নিজের পায়ের শব্দে নিজেরি বুক চম্‌কে ওঠে! কোথাও লোকজন নেই—আছে খালি নীরবতা ও অন্ধকার! পথগুলো যেন ভূতুড়ে পথ—প্রেতলোকের রহস্য যেন চারিদিকে স্তম্ভিত হ'য়ে আছে!

কিন্তু চিৎপুর রোডের উত্তরাংশ এখন ঘুমোয় নি—যদিও তার দৃশ্য গেছে বদ্‌লে। তার পথিকদের চেহারায় আর ব্যস্ততা বা কর্ম্মশ্রান্তি বা মলিনতার কোন চিহ্নই নেই—তাদের দেখলেই বোঝা যায়, তারা বেরিয়েছে অবসর-যাপনের আনন্দের সন্ধানে। দিনের বেলায় এরাই যে ময়লা,

ঘর্ম্ম-সিক্ত জামা-কাপড় প'রে এই পথ দিয়েই আধ-সিদ্ধ ভাত-তরকারি ভরা পেটে ছ্যাক্‌রা-গাড়ীর ঘোড়ার মত আপিসের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে, তারপর সারাদিন কলম পিষে, বড়বাবুর বকুনি ও সাহেবের হুম্‌কি হজম ক'রে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বাড়ীর পানে ফিরে এসেছে, এদের দিকে তাকিয়ে এখন আর হলপ. ক'রে কেউ সে কথা বল্‌তে পারবে না। কাল রবিবার, সকালে উঠে আর আপিসের তাড়া নেই, সকলের মুখ তাই নিশ্চিন্ত আনন্দে উদ্ভাসিত! ছোট-বড় ক'রে ছাঁটা চক্‌চকে চুলে বাঁকা টেড়ি কাটা, "হেজেলিন স্নো" মেখে মুখের রং তাজা, অনেকের চোখে সখের চশ্‌মা, ঠোঁটে সস্তাদামের সিগারেট, গায়ে মিহি কাপড়ের চুড়ীদার পাঞ্জাবী, পরোণে দেশী তাঁতের ফিন্‌ফিনে, কোঁচানো কাপড়, বাঁ-হাতে 'রিষ্ট-ওয়াচ', ডান-হাতে রূপো-বাঁধানো ছড়ি, আঙুলে আংটি ও পায়ে নানা আকারের সৌখীন জুতো! কেউ কেউ পকেট ভ'রে টাকা নিয়েছে এবং রৌপ্যের গন্ধ পেয়ে সুখের পায়রারাও অম্‌নি বন্ধুত্বের ভাণ দেখিয়ে তাদের সঙ্গী হয়েছে! বিডন স্কোয়ারের মোড়ে ফুলওয়ালার কাছ থেকে দলের বড়বাবুরা কয়েক ছড়া ক'রে বেলফুল কিনলেন। একছড়া খুলে তখনি নিজের হাতে জড়িয়ে নিলেন—বাকিগুলি যথাসময়ে কোন বারান্দা-বিলাসিনীর সাধের খোঁপায় গিয়ে উঠ্‌বে!… …দু-ধারের বারান্দার দিকে নির্লজ্জ ও সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে বাবুরা তাড়াতাড়ি ছুটেছেন—এখনি আটটা বেজে যাবে, তার আগেই "মামার দোকানে" ঢুকে সুরা-দেবীকে ক্রয় করা চাই!… …এই আবু-হোসেনরা আজ একদিনেই হয়তো আপিসের সারা-মাসের শ্রমলব্ধ অর্থকে ফূর্ত্তির স্রোতে অতলে তলিয়ে দেবে, শেষ-রাতে বা কাল সকালে এরা যখন অবসাদে এলিয়ে প'ড়ে, অনিদ্রায় আরক্ত চক্ষু নিয়ে বাড়ীর দিকে ফির্‌বে, তখন এদের ট্যাঁক হাত্‌ড়ালে কেউ একটা আধ্‌লাও আর খুঁজে পাবে না!

রাস্তা দিয়ে গাড়ীর পর গাড়ী ছুটছে—টম্‌টম্‌, ল্যাণ্ডো, ফিটন, পাল্কী,

বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে ব'সে আছে—তাদের মুখের ভাব দেখ্‌লে মনে হয়, দুনিয়ায় যেন তারা ছাড়া আর মানুষ নেই—পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে, তারা যেন কীট-পতঙ্গেরই সামিল, তারা গাড়ীর তলায় চাপা পড়্‌লেও সংসারের কিছুমাত্র লোক্‌সান্‌ হবে না! এই-সব লক্ষ্মী-প্যাঁচা দিবা-নিদ্রায় দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে জেগে ওঠে এবং রাত্রি-বেলায় বাড়ীর-বাইরে-বাঁধা নির্দ্দিষ্ট সুখ-নীড়ের দিকে ধাবিত হয়—নিয়মিতরূপে সেখানে না গেলে এদের একঘেয়ে জীবনের অবসাদ কিছুতেই ঘুচ্‌তে চায় না!... ...অনেক গাড়ীর আরোহীই মাড়োয়ারী। ছাতু খেয়ে কাঠখোট্টার মুল্লুকে মানুষ হ'য়ে এই জীবগুলি বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি মাথায় ক'রে প্রথম বাংলা দেশে এসে আড্ডা গেড়ে বসে। তারপর গেল-যুদ্ধের সময়ে "স্পেকুলেশনে"র মহিমায়-অকস্মাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যের বোঝায় ভারগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। সেই ভার এখন তারা চট্‌পট্‌ কমিয়ে ফেল্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! বিলাসী বাঙালীর আদরের সহর কল্‌কাতা—হাল-ফ্যাসানে প্রাচ্যে অগ্রগণ্য! বাঙালী বাবুদের দেখাদেখি মেড়ুয়ারাও ছাতুর স্বাদ ভুলে 'সভ্য' হ'য়ে উঠ্‌ছে,—মুখে ভাঙা ভাঙা বাংলা বুলি, পরোণে বাংলা পোষাক! অনেকেই টিকি ছেঁটেছে বা সংক্ষিপ্ত ক'রে এনেছে—মাথায় দশআনা-ছ'আনা চুলের বাহার! বাঙালী আবুহোসেনরা তাদের জ্বালায় আতঙ্ক হ'য়ে উঠেছে—কারণ সহরের ভালো ভালো ডানা-কাটা পরীর দল আজ ছাতুখোরদের সোনার টিকিতে বাঁধা! তারা নতুন বড়মানুষ, কথায় কথায় টাকা বৃষ্টি করে—বাবুদের সাধ্য কি তাদের সঙ্গে পাল্লা দেন! কিন্তু বাবুর দলকে আমি অভয় দিচ্ছি! দুদিন সবুর করলেই মেওয়া ফল্‌বে! মাড়োয়ারীরা বাবুদের উপরে টেক্কা মারবার জন্যে যে-রকম উঠে প'ড়ে লেগেছে, টাকা নিয়ে যে-রকম ছিনিমিনি খেলা সুরু করেছে—তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, রসাতলে যেতে তাদের আর বেশী দেরি লাগ্‌বে না। ফিরিঙ্গীদের নকল ক'রে যেমন অনেক নব্য বাবু চুলোয় গিয়েছেন,

ট্যাক্সিস্তে চ'ড়ে যাচ্ছে অধিকাংশ হঠাৎ-বাবুর দল। বাপ-মায়ের লোহার সিন্ধুকে বা গয়নার বাক্সে সকলের অগোচরে হাত চালিয়ে, বা 'হ্যাণ্ড-নোট' কেটে বা অন্য কোন উপায়ে এদের অনেকে হঠাৎ কিছু টাকা সংগ্রহ করেছে —এরা তারই সদ্ব্যবহার করতে চলেছে! দিনকতক পরেই এদের ট্যাক ফের গড়ের মাঠ হবে, তারপর হয়তো একদিন দেখা যাবে, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে না পেরে অনেকেই আদালতে গিয়ে শুষ্কমুখে আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছে!

সোনাগাছি বা রূপোগাছির কাছে গিয়ে অধিকাংশ গাড়ীই খালি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ী থেকে যারা নামছে তাদের ভিতরে কেবল সুবর্ণ-গর্দ্দভ, মাড়োয়ারী বা হঠাৎ-বাবুরাই নেই—একটু কাছে এগিয়ে এলেই দেখ্‌বেন, অনেক বিখ্যাত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকিল, অ্যাটর্নি, ডাক্তার, এম-এল-সি, নন-কো-অপারেটর, বক্তা, পণ্ডিত, সম্পাদক ও সাহিত্যিকও এই দলে আছেন! এমন-কি, সহর থেকে বারবনিতা উঠিয়ে দেবার জন্যে যে-সব সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি প্রকাণ্ড সভায় প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বাহাদুরি নিচ্চেন, তাঁদেরও কেউ কেউ যে এদলে নেই, এমন মিথ্যাকথাও আমি বলতে পারব না। আমার নৈশ-ভ্রমণে আমি হিন্দু, খ্রীশ্চান, মুসলমান ও ব্রাহ্ম সমাজের অনেক বড় বড় মাথাওয়ালা লোককে স্বচক্ষে এই-সব স্থানে দর্শন করেছি! প্রথম প্রথম অবাক হতুম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতুম না। এখন দেখে দেখে আর অবাক হই না—কারণ এখন আর চোখের উপরে নয়, কল্‌কাতার বাসিন্দাদের তথাকথিত সাধুতার উপরেই আমি সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কোথায়, কবে, কাকে দেখেছি, সে কথা আমি অবশ্য এখানে বল্‌তে চাই না—কিন্তু এ-কথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি যে, কল্‌কাতার অধিকাংশ লোকই জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বারবনিতার ঘরে আসা-যাওয়া করে। সমাজে এরা কেউ ধরা পড়ে না—এদের মুখোস এম্‌নি নিখুঁৎ!

চিৎপুরের উল্লাস-ধ্বনি ততই উচ্চতর হয়ে ওঠে! তখন দেখা যাবে, আশ-পাশের অলি-গলি থেকে সারি সারি ট্যাক্সি বেরিয়ে এসে চিৎপুর রোডের উপর দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ময়দানের দিকে ছুটছে! অধিকাংশ গাড়ীর আরোহীই তখন চুচ্চুড়ে মাতাল এবং প্রায় প্রত্যেক গাড়ীতেই একটি বা দুটি স্ত্রীলোক পুরুষদের কোলে বা বুকের উপরে নেশায় এলিয়ে প'ড়ে আছে! গাড়ীর ভিতরে ব'সেই সবাই বিকট স্বরে হৈ হৈ করছে,—কেউ সচীৎকারে প্রেম জানাচ্ছে, কেউ অশ্লীল ভাষায় গান গাইছে, কেউ নেশার খেয়ালে আবোল-তাবোল বকছে! কোন কোন গাড়ীতে আবার হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গানও চলেছে এবং সে-সব গান হচ্ছে এই ধরণের—

"আমার ভালোবাসা আবার কোথায় বাসা বেঁধেচে!
পিরিতের পরোটা খেয়ে মোটা হয়েচে!
মাসে মাসে বাড়্‌চে ভাড়া,
বাড়ীউলী দিচ্ছে তাড়া,
গয়লাপাড়ার ময়লা ছোঁড়া প্রাণে মেরেচে!"

প্রকাশ্য রাস্তায়, সকলের চোখের সাম্‌নেই, খোলা গাড়ীর ভিতরে স্ত্রী-পুরুষে চুম্বন আলিঙ্গনও বাদ যায় না!

কল্‌কাতার নানা পথের উপরে যে-সব কালি বা অন্যান্য দেবতার মন্দির আছে, সন্ধ্যারতির সময়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন। মন্দিরের সাম্‌নে স্ত্রী-পুরুষের জনতা। দু-চার জন খাঁটি ভক্ত এবং গরিব ভদ্র-ঘরের মেয়েও সেখানে থাকেন বটে,—কিন্তু বাদবাকি বেশীর ভাগই শিকারী পুরুষ, ভদ্রঘরের কুচরিত্র স্ত্রীলোক বা বারবনিতা। কোন কোন ভদ্রঘরের মেয়ের মাথার উপরে হয়তো অভিভাবক নেই, এবং তারা যে-কারণেই হোক্ বাজারের বারনারীর মত প্রকাশ্যে রূপ-যৌবন বিক্রী করতে পারে না। তারা এই-সব মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় দেব-দর্শনের ছলে আসে। রতনে রতন চেনে। কোন শিকারী পুরুষের সঙ্গে

আধ-ঘোমটার ফাঁকে চোখোচোখি হ'লেই তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তারপর তারা যখন ঘরের দিকে ফেরে, তখন প্রায়ই দেখা যায় তাদের পিছনে পিছনে মধুলুব্ধ ভ্রমরেরও অভাব নেই! সময়ে সময়ে বড় বড় পাকা শিকারীরাও ভ্রমে প'ড়ে গৃহস্থের সতী কুলবধূর পিছনে অনুসরণ করে। পরিণাম—লগুড়ের রসাস্বাদ ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পলায়ন! কিন্তু এত লাঞ্ছনাতেও হতভাগাদের চৈতন্য হয় না—মন্দির-দ্বারে পরদিন ঠিক আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ধর্ণা দেয়! একশ্রেণীর পুরুষ আছে, সাধারণ বারবনিতার চেয়ে এইরকম অপ্রকাশ্য কুলটাদেরই তারা বেশী পছন্দ করে! বারবনিতারাও এই প্রকৃতির পুরুষদের চরিত্র বোঝে। তাই তাদেরও অনেকে মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখবার অছিলায়, মুখে ঘোম্‌টা টেনে গৃহস্থের বউ সেজে পুরুষদের চোখে ধূলো দিতে ছাড়ে না! ......এই নারীর পিছন-নেওয়া অভ্যাসের ফলে মাঝে মাঝে কতক-বিয়োগান্ত প্রহসনের অভিনয় হয়। অনেক সময়ে এক নারীর পিছনে একাধিক রূপ-রসিকের সমাগম হয়। তখন প্রত্যেকে প্রত্যেককে ছাঁটাবার মৎলোবে হরেক রকম কৌশল অবলম্বন করে—চোক-রাঙানি, গালাগালি, মারামারি কিছুই বাদ যায় না। মানুষের ভিতরে এখনো কুকুর-বিড়ালের স্বভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

শেষ-রাত্রে গঙ্গার ধারে এই ধরণের আর এক দৃশ্য দেখা যায়। রাতশেষে অন্ধকারে মুখ ঢেকে অনেক পরপুরুষ-দৃষ্টি-ভীত কুল-নারী প্রাতঃস্নানে যান। তাঁরা যে সবাই সতী সাবিত্রী, তা নন। তাঁদের ভিতরেও অনেক ভেজাল আছে—তারা এই সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। শিকারী পুরুষরাও এ সন্ধান রাখে। তারাও দলে দলে এই সময়ে বেরিয়ে পড়ে এবং ওৎ পেতে ব'সে থাকে। অনেকের সন্ধানে খালি বাড়ী আছে। হস্তগত শিকারকে নিয়ে পুরুষরা এই-সব

এদের প্রলোভনে প'ড়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করে—কেউ কেউ আর ইহজীবনে বাড়ীতে ফেরে না। সঙ্গে পুরুষ-রক্ষক না থাকলে, শেষ-রাতে বাড়ীর মেয়েদের কখনো গঙ্গাস্নানে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

বড়-বাজারের দিকে গঙ্গাতীরেও পশ্চিমা মেয়েদের জন্যে খালি-বাড়ী আছে শুনেছি—কিন্তু আমি নিজের চোখে তা দেখি নি। এ-সব বাড়ীতে মেয়েদের জন্যেই নাকি বাহির থেকে পুরুষ সংগ্রহ করা হয়! পশ্চিমা যুবতীরা নাকি এখানে এসে সংগৃহীত পুরুষদের সহবাসে আপনাদের বাসনা চরিতার্থ ক'রে যায় এবং বলা বাহুল্য যে, এজন্যে তাদের টাকা খরচও করতে হয়। কিন্তু শোনা কথায় নির্ভর ক'রে এ-সম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু বলতে পারি না। ব্যাপারটা সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যাও হ'তে পারে—তবে কল্‌কাতায় অসম্ভব ব'লে কোন-কিছু নেই।

অসম্ভব নয় বলছি এই জন্যে যে, এর চেয়েও উদ্ভট কাণ্ড আমি বাঙালী-পাড়ায় ঘটতে দেখেছি। এই কদর্য্য রোম্যান্সের নায়িকা হচ্ছেন, কল্‌কাতার কোন প্রাচীন ও বিখ্যাত ধনী-পরিবারের এক মহিলা। অল্প বয়সেই তাঁর স্বামী পরলোকে যান—বিধবা পত্নীর মাথার উপরে আর দ্বিতীয় অভিভাবক না রেখে। গঙ্গার কাছাকাছি কোন পল্লীতে এই মহিলা একাকিনী প্রকাণ্ড এক অট্টালিকায় বাস করতেন, একমাত্র শিশু-পুত্রকে নিয়ে। এঁর লালসা মেটাবার পদ্ধতি ছিল যেমন কুৎসিত, তেম্‌নি অভিনব। শেষ-রাতে ইনি গাড়ীতে চ'ড়ে সঙ্গে জনকতক বিশ্বাসী দ্বারবান নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন—যদিও স্নান করতেন না! আগেই বলেছি, এ-সময়ে শ্রেণীবিশেষের পুরুষও শিকারের খোঁজে বেরোয়। এই রূপসী যুবতী সেই শিকারীদের উপরেই শিকার করতেন! যাকে দেখে তাঁর পছন্দ হোতো, তাকে তিনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তেন। কেউ কেউ প্রকাণ্ড গাড়ী ও দ্বারবান দেখে তাঁর সঙ্গে আসাটা নিরাপদ বিবেচনা কর্‌ত না—এ-হেন

রূপসীর লোভ ছেড়েও প্রাণপণে পালাতে চাইত—ভাবত বোধ হয়, এ হচ্ছে কোন বিপদজনক ফাঁদ! সে-ক্ষেত্রেও কম্‌লী তাদের ছাড়ত না! মহিলার ইঙ্গিতে দ্বারবানরা সেই কাপুরুষ প্রেমিককে ছোঁ মেরে গাড়ীর ভিতরে টেনে তুল্‌ত! গাড়ী যখন প্রকাণ্ড অট্টালিকার ফটকের মধ্যে ঢুকৃত, বন্দী বেচারী তখন ভয়ে কাঠ হ'য়ে ভাবৃত—আজ সে নিশ্চয়ই গুম্ খুন হবে!... ...ঐ মহিলাটি একসময়ে প্রায়ই অজানা প্রেমিকের জন্যে এম্‌নি অপূর্ব্ব অভিসার-যাত্রা কর্‌তেন। এখন তিনি শান্ত হয়েছেন—কারণ তাঁর পুত্র সাবালক-!... ... ...

ঢং, ঢং, ঢং! ঘড়ীতে রাত তিনটে বাজ্‌ল।... ...এই সময়ে সে-রাতের মত ফূর্ত্তিতে ক্ষান্তি দিয়ে অধিকাংশ সখের বাবুই বাড়ীমুখো হন। চিৎপুরের চারিদিক ঘন ঘন মোটরের ভেঁপুতে শব্দিত হয়ে ওঠে। অনেকেই ট্যাঁকের শেষ-কড়িটি পর্য্যন্ত সে-রাত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে সমর্পণ ক'রে আসেন, তাঁদের শ্রীচরণ ভরসা বৈ আর গতি নেই। পাণের 'পিক' লাগা এলমেল জামা-কাপড়ে, উস্কখুস্ক চুলে, নেশায় জবাফুলের মত টক্‌টকে চোখে, গ্যাসপোষ্টে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে 'রাতের পাখী'রা বাসায় ফেরে—পথের মোড়ে মোড়ে পাহারাওয়ালারা বাড়ীর রোয়াকে ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছে—হঠাৎ পদশব্দ শুনে ধড়্‌মড়িয়ে জেগে 'কোন্ শ্বশুরা রে!' ব'লে হুমকী দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং অনেককেই ধ'রে গুঁতো মার্‌তে মার্‌তে থানায় টেনে নিয়ে যায়!

যেখানে পাহারাওয়ালা নেই, সেখানে আচম্বিতে আকাশ থেকে সন্ত-পতিতের মত এক-একটা কালো-মুস্ক লম্বা-চওড়া জোয়ান মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়! তার পর মাতালদের নেশা ছুট্‌তে না ছুট্‌তে তাদের শাল-আলোয়ান বা রেশমী চাদর, ঘড়ী বা চেন যা-কিছু পায় টেনে ছিনিয়ে নিয়ে যেমন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল তেম্‌নি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়! যারা তাদের বাধা

ইঞ্চি ইস্পাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ! এম্‌নি সব বিপদ এড়িয়ে রাতের যে পাখীগুলি শেষটা নিজের ডেরায়—পতিব্রতা সতী স্ত্রী যেখানে সারা রাত অশ্রুজলে শয্যা সিক্ত কর্‌ছে—গিয়ে আবার হাজির হ'তে পারে, তারা যথার্থই ভাগ্যবান ! অর্থনাশ, স্বাস্থ্যনাশ, অপমান—এমন-কি প্রাণনাশের ভয় পর্য্যন্ত না রেখে যারা নিত্য এহেন জীবনযাপন করে, তারা যে কেমন মানুষ সেটা একবার ভেবে দেখুন !)

কল্‌কাতার ফিরিঙ্গী-পল্লীর দৃশ্য রাত্রে ভিন্ন রকম। সেখানকার প্রকাশ্য জীবন-লীলা দেখা যায় প্রধানত চৌরঙ্গী, কার্জ্জন পার্ক, ইডেন গার্ডেন, গড়ের মাঠ ও ঘোড়দৌড়ের মাঠের ভিতরে। বাঙালী-পাড়ার সঙ্গে এ অঞ্চলের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে,—এখানে সাধারণত হট্টগোল ও মলিনতা নেই। মানুষগুলিও যেমন সুন্দর ফিট্‌ফাট্, পাড়াও ঠিক তেম্‌নি। চৌরঙ্গীর ধারে ধারে অগণ্য দোকান ও হোটেল আলোক-মালা প'রে পথিককে যেন সাদর আহ্বান কর্‌ছে ! হোটেলগুলির ভিতরকার দৃশ্য দেখ্‌লে মনে হয়, যেন সমুজ্জ্বল পরীস্থানের এক-একটি টুক্‌রো কোন গতিকে হঠাৎ খ'সে এখানে এসে পড়েছে ! এত আলো ! এত লতা-পাতা ফুল ! এত সাজসজ্জা ! চোখ যেন তৃপ্ত হয়ে যায় ! তালে তালে মধুর স্বরে ঐকতান বাজ্‌ছে, জীবন্ত ছবির মত সুন্দর লোকগুলি আনা-গোনা কর্‌ছে, কোথাও একটু বেসুরো আওয়াজ নেই—সমস্তই ধরা-বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পাদিত হচ্ছে ! এমন ভাবে বাঙালী জীবনকে উপভোগ করতে জানে না।

এ অঞ্চলে পথের ধারে ধারে বায়োস্কোপ ও থিয়েটারের আলোকোজ্জ্বল অট্টালিকাগুলির সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে থাকে—সে ভিড়ের ভিতরে বাঙালী, মাড়োয়ারী, মুসলমান ও য়ুরোপীয় অনেক জাতের লোককেই দেখা যায়। মাঝে মাঝে কাঁটা-জঙ্গলে ফুটন্ত গোলাপের মত,

সুন্দরীরা নয়ন-মনকে মোহিত ক'রে দেন। অধিকাংশ রঙ্গালয়ের সাম্‌নে প্রায়ই রূপপিপাসী বাঙালী যুবকরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। মোটরের পর মোটর আস্‌ছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে বিলাতী রূপসী রং-বেরঙের নানান রকম হাল-ফ্যাসনের পোষাক প'রে নামছে এবং যুবকরা হতাশ অথচ সতৃষ্ণ নয়নে তাদের পানে তাকিয়ে আছে! কিন্তু হায়, এযে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! কবি তো স্পষ্টই ব'লে গেছেন, কেবলমাত্র নয়ন দিয়ে ষোলো বছরের জ্যান্ত মেয়ে আহার করা সম্ভব নয়! রবীন্দ্রনাথও এদেরই মনের কথা এই দুই পংক্তিতে ব্যক্ত করেছেন—

"বিধি, ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল,
সেকি, আমার পানে ভুলে পড়িবে না!"

আধুনিক বিলাতী রূপসীদের নৈশ পোষাক একান্ত মারাত্মক! একে তো তাঁদের রং ফাটা বেদানার মত অপূর্ব্ব, তার উপরে সেই যৌবনপুষ্ট তনুলতার উর্দ্ধাংশ একেবারেই উন্মুক্ত—অনেকেরই দুধের মত ধবল উচ্চ বক্ষ বিচিত্র নগ্ন সৌন্দর্য্যে দর্শকের চক্ষুকে রীতিমত স্থির ক'রে দেয়! খুনীরা মানুষের দেহকে হত্যা করে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গসুন্দরীরা হত্যা করেন মানুষের মনকে! আইন-অনুসারে এঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। যুবকরা সাবধান, ফিরিঙ্গী-পাড়ায় এ-সব আলেয়ার আলোর দিকে তাকানো মিছে,—কারণ এরা দেখা দেয়, ধরা দেয় না!··· ···এই ভিড়ের মধ্যে এক শ্রেণীর বঙ্গ-বালাও বিচরণ করেন—তাঁদেরও পোষাক কিম্ভূতকিমাকার—দেশী-বিলাতী ফ্যাসনের 'ঘণ্ট'বিশেষ! তবে অনেকেই বোধ হয় এই ভেবে দুঃখ পান যে, কেন এঁরা এখনো বুকের কাপড় খুলে পথে বেরুতে শেখেন নি? আমাদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে খুব-সম্ভব এমন দুঃখ প্রকাশেরও অবকাশ থাক্‌বে না—"আসিবে, সেদিন আসিবে!"

সন্ধ্যাবেলায় এখানে একরকম খালি ফিটন গাড়ী পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

এ-সব গাড়ী রহস্যপূর্ণ। আপনি যদি রসিক হন, তবে এই গাড়ীগুলিকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবেন। এর ভিতরে উঠে বসুন, চালক আপনাকে বিনাবাক্যব্যয়ে শ্রেণীবিশেষের শ্বেত-রূপসীর কাছে নিয়ে যাবে—তারা টাকার বিনিময়ে অনায়াসে দেহকে বিকিয়ে দেবে। তবে আপনার দেহে ফিরিঙ্গী পোষাক থাকা চাই। সন্ধ্যার মুখে অনেক বাঙালীর ছেলেকে এই উদ্দেশ্যে এখানে ঘুরুর ঘুরুর করতে দেখবেন!

বিলাতী রূপজীবিনীরা সন্ধ্যার সময়ে পথের উপরেও আবির্ভূত হয়। কিন্তু সাধারণ ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য, চক্ষু কিঞ্চিৎ শিক্ষিত না হ'লে ধরা যায় না। তবে একটু লক্ষ্য করলেই সাধারণ বারবনিতার বিশেষত্ব তাদের খেলো অথচ রংচঙে পোষাকে, অবসাদগ্রস্ত চোখে, অত্যধিক পাউডার-রংমাখা মুখে আর হাবভাব চলা-ফেরার মধ্যেই নিশ্চিত রূপে প্রকাশ পায়। গড়ের মাঠের কোণে "কার্জ্জন-পার্কে" খানিকক্ষণ ব'সে থাক্‌লেই প্রায় এদের দেখা মেলে! 'ইডেন গার্ডেন'ও এদের একটি মস্ত শিকার-স্থান। সেখানে ঝোঁপে-ঝাপে পরপুরুষের সঙ্গে আলুথালু বেশে ফিরিঙ্গী রূপসীদের আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

গঙ্গার ঘাটে শেষ-রাত্রে একশ্রেণীর 'ভদ্রনারী'র ব্যবহারের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, সাহেব-পাড়াতেও সেই দলের ফিরিঙ্গী বা ইহুদী প্রভৃতি জাতের মেয়ের অভাব নেই। তবে সন্ধ্যার সময়েই তারা বেরোয় পুরুষের মাথা খেতে। তাদের অনেকে দিনের বেলায় টেলিগ্রাফ আফিসে কাজ করে, অনেকে টাইপ-রাইটার চালায়, অনেকে বিলাতী দোকানে "সপ গার্লে"র কাজ করে। অনেকের আবার স্বামীও আছে! যারা স্বাধীন, তারা পথ থেকে শিকার সংগ্রহ-ক'রে চুপি চুপি বাড়ী ফিরে যায়। যারা স্বাধীনা নয়, তাদের জন্যে পুরুষকে খালি বাড়ী বা অন্য কোন রকম বন্দোবস্ত করতে

সমান ভাবে আনন্দ করবে! সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারে বায়স্কোপে যাবে, হোটেলে গিয়ে খাবে, মোটরে উঠে 'জয় রাইড' করবে! সাধারণত এরা গাড়ীর ভিতরেই পরপুরুষের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পন করে। রাত্রি বেলায় গড়ের মাঠের আড়ালে-আবছায়ায় এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠের আনাচে কানাচে গেলে এই জাতীয় অনেক স্ত্রীলোকেরই লীলাখেলা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন! শ্বেতাঙ্গ পাহারাওয়ালারা এদের উপরে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে। মাঝে মাঝে এরা গাড়ীর ভিতরে পরপুরুষের সঙ্গে অকথ্য অবস্থায় ধরা প'ড়ে যায়। তখন আর এদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। আমি একবার এই দলের একটি নারীর দুর্গতি দেখেছিলুম। 'ষ্ট্র্যাণ্ডে'র ওদিকে গাড়ীর ভিতরে সে ধরা পড়েছিল। পুরুষটি ছিল গোরা। সে তো গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে কামান থেকে নির্গত গোলকের চেয়েও বেগে প্রাণপণে চম্পট দিলে—ধরা প'ড়ল স্ত্রীলোকটা। 'সার্জ্জেণ্টে'র নির্দ্দয় প্রহারে তার মুখ একেবারে রক্তাক্ত হয়ে উঠল।

কড়েয়া ও ওয়াটগঞ্জে পৃথিবীর নানা জাতীয় বারবনিতা বাস করে। কিন্তু সেখানকার পথের দৃশ্যে বিশেষ কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায় না। সে অঞ্চলের জীবন-নাট্য অভিনীত হয় প্রাচীরের আড়ালে। বাঙালী সেখানে খুব কম যায়। সাধারণত জাহাজী গোরা, কেল্লার সৈনিক, চীনা, জাপানী ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমান প্রভৃতি জাতিই সেখানকার নৈশ-অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা।

বর্ত্তমান কল্‌কাতার পথের আর এক বিশেষত্ব, গুণ্ডার ভয়। এই জাতীয় 'ভদ্রলোক'গুলি অত্যন্ত পরিশ্রমী, দিনের বেলাতেও তাঁরা ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকেন, রাত্রে তো কথাই নেই। আগে কাশী ও মির্জ্জাপুর প্রভৃতি সহর গুণ্ডার জন্যে বিখ্যাত ছিল, কল্‌কাতা কিন্তু তাদের উপরে রীতিমত

গুণ্ডা-সমাজে যাঁরা সম্ভ্রান্ত, সে মহাত্মাদের প্রধান আড্ডা হচ্ছে মেছোবাজারে ও তার আশপাশে। জাতে তারা মুসলমান—আর অর্থসম্পত্তিতে তাদের ধনকুবের বল্‌লেও চলে। হিন্দুস্থানী গুণ্ডারা সাধারণত বড়বাজার অঞ্চলে থাকে। এদের যারা দলপতি, তারা প্রায়ই এক একটা কোকেন বা জুয়ার আড্ডা খুলে বসে। আর একশ্রেণীর সর্দ্দার গুণ্ডার দল গঠন করে, তাদের কাজ পথিকের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া আর ডাকাতি করা। তার উপরে কল্‌কাতার প্রত্যেক পল্লীতেই জনকতক ক'রে স্থানীয় গুণ্ডা থাকে—পাড়ার লোকদের কাছে যারা যমের মত।

রাত্রে মেছোবাজারের কফিখানাগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। ঐ জনতার মধ্যে আপনি যাদের দেখবেন, তাদের বারো আনাই সাংঘাতিক চরিত্রের লোক। যত খুনে, জুয়াড়ী, গুণ্ডা, চোর, ডাকাত আর পকেট-কাটা ঐখানে একসঙ্গে ব'সে খাওয়া-দাওয়া ও মেলামেশা ক[illegible]। অর্থাৎ কফিখানা হচ্ছে তাদের ক্লাবের মত। অধিকাংশ দাগী বা পলাতক গুণ্ডাই দিনের বেলায় পুলিসের ভয়ে বাইরে মুখ দেখাতে পারে না, তাই রাত্রিই হচ্ছে তাদের উপভোগের কাল। খাওয়া-দাওয়া ও গল্পস্বল্পের পর তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—শিকারের খোঁজে।

সাধারণত গুণ্ডারা নিজেদের পাড়ায় অত্যাচার করে না। নিজের পাড়ার প্রতি প্রেম এ সদাশয়তার কারণ নয়,—এতে ধরা পড়বার ভয় বেশী ব'লেই গুণ্ডারা ভিন্ন পাড়ায় জোর-জুলুম করতে যায়। রাত্রে মেছোবাজার যে ভয়ানক স্থান, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ চৌদ্দ-পনেরো বৎসর ধরে মেছোবাজার দিয়ে অনেক রাতে আমি একলা আনাগোনা করেছি, কিন্তু কখনো কোন বিপদে পড়ি নি। অথচ এ অঞ্চলে বেশী রাতে যে লোকগুলিকে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ব্যাঘ্রের মত হিংস্র! অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে তারা এঁটো মাটির ভাঁড়ের মত যে কোন পথিকের দেহ এক আছাড়ে ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দেবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত

হয়ে থাকে ! তবু আমি তাদের সু-নজরে পড়ি নি। মেছোবাজারে প্রায়ই যে-সব খুনোখুনি ও মারামারির খবর পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই গুণ্ডাদের নিজেদের মধ্যেই দলাদলির ফলে হয়ে থাকে।

এদের আপনা-আপনির মধ্যে মারামারি ও খুনজখম লেগেই আছে। এর একটা দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। প্রায় পনেরো যোলো বৎসর আগেকার কথা। রহস্যময় জায়গায় যাওয়ার অভ্যাস আমার অনেকদিন থেকে—এটা আমার একটা রোগ বল্লেও চলে। আমার এক শৈশব-বন্ধু ছিল, তার নাম এখানে করতে চাই না। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি, খুব সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে তার জন্ম—তার পিতা ছিলেন সাহিত্য-সেবক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্ম্মচারী। কিন্তু এমন বংশের ছেলে হয়েও আমার বন্ধুটি কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে যায়। যত গুণ্ডার দলে ছিল তার আনাগোনা। তার গায়েও খুব জোর ছিল, আমি তাকে পনরো-কুড়ি জন হিন্দুস্থানী গুণ্ডাকে একলা মেরে তাড়িয়ে দিতে দেখেছি। এই বন্ধুকে আমি একদিন ধরে বস্‌লুম—"আমাকে একবার গুণ্ডার আস্তানা দেখাও।" সে রাজি হয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে গ্যাঁড়াতলার একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে বাড়ীটি উঁচু একতালা,—তার সাম্‌নে এক মদের দোকান ছিল। বাড়ীটি এখন নেই—'ইম্‌প্রুভমেণ্ট স্কিমে'র কবলে প'ড়ে অদৃশ্য হয়েছে।

বাড়ীর পাশে ছিল একটি সরু গলি। সেই গলি দিয়ে আমরা বাড়ীর ভিতরে ঢুকলুম—গলিটিও যেমন অন্ধকার, বাড়ীটিও তেম্‌নি। এখানকার জীবেরা আলোকে বোধ হয় একটা অকেজো উৎপাতের মত ভাবে !

অন্ধকার হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে একটা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌ছি—এমন সময় একটা বাজ্‌খাই গলার আওয়াজ জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কে ? চারিদিকে চেয়েও প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখ্‌তে পেলুম না, আমার মনে হোলো অন্ধকারই যেন কথা কইলে।

আমার বন্ধু বেশ সহজ ভাবেই বল্লে, "কে, আমীর নাকি? আরে ভাই, আমাকে চিন্‌তে পারচিস্ না?"

অন্ধকার আর কোন কথা কইলে না!

আমি হাঁপ ছেড়ে বন্ধুর সঙ্গে একেবারে মদের দোকানের ছাদের উপরে গিয়ে উঠলুম। সেখানেও প্রদীপ নেই। তবে আকাশের স্বাভাবিক আলো আর পথের আলোর প্রভাবে অন্ধকার সেখানে আবছায়ায় পরিণত হয়েছে।

দেখ্‌লুম, ছাদের উপরে প্রায় পনেরো ষোলো জন মুসলমান ব'সে আছে। তাদের সাম্‌নে দু-তিনটে মদের বোতল, কতকগুলো মাটির ভাঁড় আর খানকতক শালপাতা—বোধ হয় তাতে চাট্ আছে। তারা গল্প কর্‌তে কর্‌তে মাঝে মাঝে মদ খাচ্ছে। প্রত্যেকেরই চেহারায় এমন একটা ভাব মাখানো, যা দেখ্‌লেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে!

আমার বন্ধু তাদেরই ভিতরে গিয়ে একজনের গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'সে পড়ল এবং আর একজনের হাত থেকে ফস্ ক'রে মদের ভাঁড়টা ছিনিয়ে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে দিলে! অন্যান্য সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল!

তার পর আবার গল্প আর মদ চল্‌তে লাগ্‌ল—আমার দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না, আমি যে তাদেরি এক ইয়ারের সঙ্গে সেখানে গেছি আমার এই পরিচয়ই যেন যথেষ্ট!

খানিক পরেই দেখ্‌লুম ছাদের এক কোণে একটা গোলমাল উঠল। এতক্ষণ দেখিনি, সেখানে চার পাঁচজন লোক ব'সে ব'সে কি খেলছিল,—খুব সম্ভব জুয়া। গোলমালের সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক, আর একজনকে এক ঘুসি মারলে। ঘুসি খেয়ে সেও ঘুসি ফিরিয়ে দিলে। তার পরেই প্রথম লোকটা এক নিমেষে কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা ছুরি বার

াঘাতটা নিবারণ করলে বটে, কিন্তু ছুরিখানা তার হাতের ভিতরে বেশ খানিকটা ব'সে গেল!

তার পর কি যে হোলো, বিশেষ বুঝতে পারলুম না, কিন্তু ছাদের উপরে য যেখানে ছিল সবাই দাঁড়িয়ে উঠল! খানিক কুৎসিত ভাষার স্রোত টুল, তার পরে লোকগুলো দুইদলে ভাগ হয়ে বিষম মারামারি সুরু ক'রে দিলে। আমি তো প্রথমটা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! .চাখের সাম্‌নে দেখলুম, একজন লোক আর একজনের মাথার উপরে একটা মদের বোতল তুলে প্রচণ্ড এক আঘাত করলে—"বাপ রে বাপ্, ান গিয়া" ব'লে আহত লোকটা ছাদের উপর ঘুরে প'ড়ে গেল।

আমি বুঝলুম, এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা উচিত নয়! দৌড়ে িঁড়ির দিকে গেলুম, নীচে অম্‌নি চীৎকার শুনলুম—"পুলিস! পুলিস!" ামার বুকের রক্ত যেন জল হ'য়ে গেল! এখানে এসে পুলিসের হাতে ধরা ড়লে, আমি আর লোকসমাজে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? আমি যে খানে দর্শকের মত এসেছি, কে সে কথা বিশ্বাস করবে?

হঠাৎ পিছন থেকে আমার হাত ধ'রে কে টান্‌লে! চম্‌কে, ফিরে খি, আমার বন্ধু!

সে বল্লে "এদিকে আয়!" ব'লেই আমাকে টেনে নিয়ে ছাদের ধারে .ট গেল।

"পুলিস্ আস্‌চে—লাফিয়ে পড়্!" আমি কোন জবাব দিতে না দিতে গু এক লাফ মেরে ছাদের উপর থেকে সে অদৃশ্য হোলো!

আমিও আর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ পেলুম না—মরি আর বাঁচি যা :ক কপালে, এই ভেবে দিলুম এক লাফ, পর-মুহূর্ত্তে একেবারে মেছো-জার ষ্ট্রীটের উপরে গিয়ে পড়লুম! তার পর উঠেই প্রাণপণে দৌড়!......

আমার বন্ধুকে আর কখনো ...

তৃতীয় দৃশ্য

চীনে-পাড়া

এই যে চীনে-পাড়া, কল্‌কাতায় এটি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। বড়বাজারে মাড়োয়ারীদের, মেছোবাজারে মুসলমানদের ও চৌরঙ্গীতে ইউরোপীয়দের জাতীয় বিশেষত্বের ছাপ আছে খুব স্পষ্ট,—তবু সে-সব পাড়াতেও কল্‌কাতা আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। কিন্তু আপনি চীনে-

পাড়ার ভিতরে একবার ঢুকুন, আপনার আর মনে হবে না যে, আপনি সত্য সত্যই কল্‌কাতাতেই আছেন! রাত্রে এখানকার আলো-ছায়া
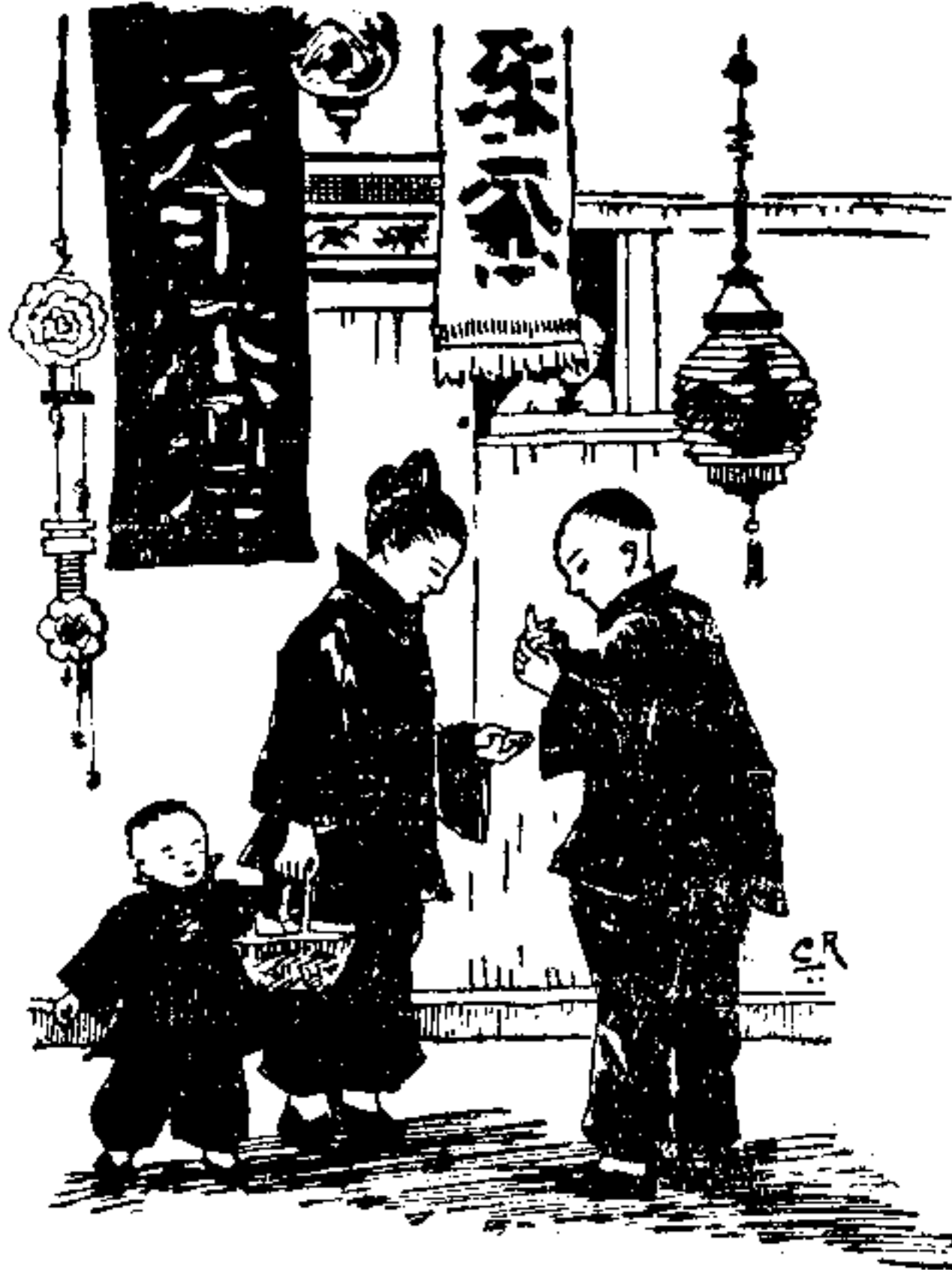
লোকজন, কথাবার্ত্তা, ঘর-বাড়ী সবই সুদূর চীনের বিচিত্র স্মৃতি আপনার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌বে।

সরু রাস্তা, সাপের মত এঁকে বেঁকে দু'ধারের বাড়ীর মাঝখান দিয়ে চ'লে গেছে। আপনি চল্‌তে চল্‌তে দু'পাশেই দেখবেন, কোথাও কোন একতালা বাড়ীর পথের ধারের খোলা ঘরে ব'সে চীনে মা পথিকদের সাম্‌নেই প্রকাশ্যে বুক খুলে অসঙ্কোচে শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছে, কোথাও বাড়ীর দরজার উপরে দুর্ব্বোধ চিত্রবৎ চীনে-ভাষায় রঙিন বিজ্ঞাপন ঝুল্‌ছে, কোথাও এক চীনে-তানসেন অচিন সুরের অদ্ভুত গান জুড়ে দিয়েছে, কোথাও-বা তিন চার জন চীনেম্যান তাদের অনুস্বর-বহুল ভাষায় কি এক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে! প্রতি পদেই প্রায় দেখ্‌বেন, একটা চীনে-সরাই বা একেলে ধরণের হোটেল, কিংবা জুয়াখানা ও চণ্ডুখোরের আড্ডা অথবা চৈনিক ধর্ম্মমন্দির! আবহাওয়া একেবারে নতুনতরো!

চীনে-পাড়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দুই বন্ধু আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন—চীনে হোটেলে খাওয়াবেন ব'লে।... ...তাঁদের সঙ্গে প্রথমে এক খাঁটি চীনে সরাইয়ে গিয়ে ঢুক্‌লুম। দুটি ঘর—একটি রান্নার ও আর একটি খরিদ্দারের জন্যে, কিন্তু রান্নাঘরটিই বড়। সেখানে মেজের উপরে নানান রকমের খাবার সাজানো রয়েছে, উপরে কতগুলো ছালছাড়ানো কাঁচা মুর্গী ঝুল্‌ছে! আহার-গৃহে তিনকোণে তিনটি ছোট ছোট কাঠের টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের দুই পাশে অত্যন্ত বিশীর্ণ প্রায়-দাঁড়ের মত দুখানা ক'রে বেঞ্চি—শুনলুম এ-রকম আসন নাকি চীনে-সরাইয়েরই বিশেষত্ব! দরজার পাশের এককোণে একটা উঁচু টেবিল, তাতেও নানান রকম খাবার, বোতল ও পাত্রাদি সাজানো এবং টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে হাসি-মুখে দোকানের মালিক।

আমরা একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বস্‌লুম—নাকে যেন কেমন

নয়। পাশের টেবিলে দুজন চীনেম্যান মাঝে মাঝে মুখের সাম্‌নে বাটি তুলে, দুটো কাঠি দিয়ে কি খাবার নিয়ে খাচ্ছে. মাঝে মাঝে কথা কইছে, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমাদের মুখের পানে চেয়ে দেখছে—খাঁটি চীনে-সরাইয়ে আমাদের মত নব্য বঙ্গের হাল-ফ্যাসানের নমুনার আবির্ভাব যে প্রায়ই ঘটে না, তাদের চোখের ভাব দেখে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। আহারকালে চীনেম্যানদের মুখের অদ্ভুত ভাবও দর্শনীয়—কিন্তু কলমে তা অবর্ণনীয়।

বন্ধুর ফরমাজে একটি ছোক্‌রা চীনে-বেয়ারা আমাদের ক'জনের জন্যে একখানা মাত্র ছোট সান্‌কিতে খানিকটা মাংসের তরকারি, এক এক বাটি ভাতের ফেন, ঝুরি-ভাজার মত একথালা আলু না ময়দায় তৈরি কি-একটা

জিনিষ এবং প্রত্যেকের জন্যে দুটো ক'রে কাঠি রেখে গেল। এই কাঠি হচ্ছে চীনেম্যানদের ছুরি-কাঁটা। খাবারগুলি খেতে নেহাৎ মন্দ লাগ্‌ল না।

শুনলুম, এখানে খুব সস্তায় মদ বিক্রী হয়। অন্য অন্য জায়গায় যে মদের এক এক 'পেগে'র দাম পাঁচসিকা, এখানে তাইই পাওয়া যায় মাত্র সাড়ে পাঁচ-আনায়! এত সস্তার কারণ, এখানে মদ আনা হয় আবগারী বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে। এখানে চীনে মদও পাওয়া যায়, তার দাম কিন্তু বেশী। এই সুসংবাদ বোধ করি বাঙালী মাতালদের কাণে গিয়ে এখনো ওঠেনি—নইলে এতক্ষণে এ স্থানটা নিশ্চয়ই লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকৃত! .মন প্রকাশ্যভাবে এরা কোন্ সাহসে মদ বিক্রী করে, বলা যায় না। খুব সম্ভব, অচেনা মাতাল এখানে এসে আবদার করলে দোকানের মালিক তাকে গলাধাক্কা দেয়।

তার পরে গেলুম আর একটা দোকানে। সে দোকানের মালিক কে তা জানি না, কিন্তু মালিকের স্ত্রী নিজেই এসে একগাল হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন ও নিজের হাতেই আমাদের জন্যে 'কোকো' তৈরি ক'রে দিলেন। এ ঘরেও দু-দিকে দুটো টেবিল। একটার উপরে কতকগুলো চীনে-মিষ্টান্ন সাজানো।—আর একটা টেবিল খুব উঁচু—তার উপরে তিন-চারিটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু কখনো গড়াগড়ি দিচ্ছে ও কখনো পরস্পরের সঙ্গে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া কামড়ি করছে। টেবিলের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগ্‌ল—মালিকের জামাই ও তার বালিকা স্ত্রী। মেয়েটি এই বয়সেই মা হয়েছে—আমাদের বাঙালী বালিকার মত। আমরা যখন বিদায় নিলুম—মালিকের স্ত্রী তখন দরজা পর্য্যন্ত এসে আমাদের এগিয়ে দিয়ে সেলাম করলেন। এই বিদেশিনীর ভদ্রতায় মুগ্ধ হলুম।

তার পর আর একটি চীনে-সরাইয়ে ঢুকলুম। এটি আকারে মস্ত বড় ও খুব সাজানো-গুছানো। ভিতরে ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলছে, হরেক-রকম গোলমাল শোনা যাচ্ছে, ব্যস্ত ভাবে লোক আনাগোনা করছে, চীনে-ম্যানরা চেয়ারের উপরে উবু হ'য়ে খেতে বসেছে। একটি লোক পরিবেষণ করছে—উচ্চস্বরে গান গাইতে গাইতে! আমরা একটি কোণের ঘরে গিয়ে

বস্‌লুম—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। টেবিলের উপরে হরেক-রকমের চীনে-খাবার সাজানো আছে—যার যা খুসি নিজেই নিয়ে খেতে পারে। ছু-চারটে খাবার খেয়ে আমরা চীনে-চায়ের ফরমাজ করলুম। একটি চৈনিক যুবতী এসে হাতল-হীন চীনে-বাটিতে খানিকটা ক'রে চা রেখে গরম জল ঢেলে, তার উপরে আর একটা বাটি চাপা দিয়ে গেল। খানিক বাদে চায়ের পাতা সিদ্ধ হোলো। কিন্তু উপুড় করা বাটিটা এম্‌নি তেতে উঠল যে, সেটি নামানো অসম্ভব—কারণ তাতেও হাতল নেই। চা-খোর চীনেম্যানদের চা-তৈরির এ ব্যবস্থাটা মোটেই সুবিধাজনক ব'লে মনে হোলো না।

এক বন্ধু বাহাদুরি ক'রে বাটিটা নামাতে গেলেন—কিন্তু পারবেন কেন? খানিকটা চা চল্‌কে টেবিলের উপরে এসে পড়্‌ল, তার পর আমাদের দুরবস্থা দেখে সেই চীনে-যুবতীটি এসে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে। চীনে-চায়ে দুধও নেই চিনিও নেই—তবু আমার বড় মন্দ লাগ্‌ল না, যদিও তার গন্ধটা চিরেতার মত!... ... ...খানিক পরে দেখি, অনেকে এসে উঁকি মেরে আমাদের দেখে যাচ্ছে! চৈনিক সুন্দরীটি নিশ্চয় বাইরে গিয়ে প্রচার ক'রে দিয়েছেন যে—এ ঘরে এমন একদল জানোয়ার এসেছে যারা কি-রকম ক'রে চা খেতে হয়, তা পর্য্যন্ত জানে না! যা হোক, আমরাও অপ্রস্তুত হবার পাত্র নই—দিব্য গম্ভীর মুখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলুম—যেন কিছুই হয় নি!

... ...আমি লক্ষ্য করলুম, যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ ধ'রেই একজন চীনেম্যান পাশের ঘর থেকে গম্ভীরভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে! আমার সঙ্গে বারংবার চোখোচোখি হ'লেও একবারও সে চোখ নামালে না, টেবিলের উপরে দুই কনুই রেখে তেম্‌নি নিষ্পলক নেত্রেই আমার দিকে তাকিয়ে রইল! আমি তার দিকে চেয়ে দু-একবার হাসলুম, কিন্তু তবু তার মুখোসের মতন স্থির মুখের একটিমাত্র মাংসপেশীও সঙ্কুচিত

পরিচিত! ... ...কি চায় সে? আমাকে সম্মোহিত করবে নাকি? এমন অস্বস্তি হ'তে লাগল!... ...ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তবে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম!

যেতে যেতে দেখ্‌লুম, এক জায়গায় একটা আলোকোজ্জ্বল লম্বা ঘর থেকে টাকার আওয়াজ ও বহু কণ্ঠের মৃদুধ্বনি উঠছে। উঁকি মেরে দেখ্‌লুম, সত্যই সে ঘরে অনেক লোক, সবাই চীনেম্যান। তার পর শুন্‌লুম, এটা জুয়াখানা। জুয়াখেলা নাকি চীনেদের ধর্ম্মানুমোদিত, জুয়া না খেল্‌লে তাদের ধর্ম্মহানি হয়! তাই প্রকাশ্যভাবে জুয়া খেল্‌লেও গভর্মেণ্ট তাদের বাধা দেন না। অধিকাংশ চীনেম্যানই নিয়মিতভাবে জুয়া খেলে।

মগ, ফিরিঙ্গী, চীনেম্যান ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানে পরিপূর্ণ, সঙ্কীর্ণ ও মলিন গলির ভিতরে এগিয়ে আমরা আর দুটি হোটেল দেখ্‌লুম—এ দুটি হোটেল একেবারে য়ুরোপীয় ধরণে সাজানো গুছানো। আমরা শেষোক্ত হোটেলে প্রবেশ করলুম। ঢুকবামাত্র এক বুড়ো ও রোগা চীনেম্যান শুষ্ক, ভাবহীন মুখে আমাদের অভিবাদন করলে—তার পরই এল এক ছিপ্‌ছিপে যুবক, তার মুখ হাসিখুসিতে ভরা।

বার্ণিস-করা কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটি কোণের ঘরে গিয়ে আমরা ব'সে পড়লুম—দুজন খিদমৎগার এল, তারা চীনে নয়, মুসলমান। চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, চীনে পাড়ার এই চীনে-হোটেলে চীনে-আবহাওয়া একটুও নেই।

ও-পাশের একটা ঘরের পর্দ্দা খোলা ছিল,—একটি যুবতী মেম হাতে মদের গেলাস নিয়ে একবার লীলাভরে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, একবার আসনে ব'সে ব'সেই পুলকে নেচে নেচে উঠছে, একবার ঘরের অদৃশ্য অংশের কোন সাহেবের সঙ্গে সুরাজড়িত স্বরে ইয়ার্কি করছে! হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার কালো চেহারা চোখে পড়তেই সে উত্তেজিত স্বরে ডাকলে—

তার ঘরের পর্দা টেনে দিতে বল্‌লে—আমার কালো মুখ বোধ হয় তার ফূর্ত্তির রং ময়লা ক'রে দিচ্ছিল !—অথচ এ-শ্রেণীর মেমদের আমি খুব চিনি! আজ কোন শ্বেতাঙ্গের ঘাড় ভেঙে সে নিজের হোটেলের খরচ চালিয়ে নিচ্ছে ব'লেই কালো চেহারার উপরে মৌখিক রাগ দেখাচ্ছে, কিন্তু কাল আমার পকেটে টাকার আওয়াজ শুন্‌লে এই সুন্দরীটিই আমার পাশে এসে ব'সে অম্‌নি ভঙ্গিভরেই হেসে মুচ্‌কে পড়বে !

এখানকার এই দুটি হোটেলে রাত্রিবেলায় সুরা ও নারীর মহিমা নগ্ন-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এটি বেপাড়া—চেনা লোকের সঙ্গে চোখোচোখি হবার ভয় নেই, তাই অনেকে ইংরেজ ও বাঙালী এখানে এসে রাত্রির খানিক অংশ বেপরোয়া ফূর্ত্তিতে কাটিয়ে দেয়। এখানকার লোকগুলি অনেক যুবক ও যুবতীকেই টেবিলের তলায় নেশায় বেসামাল হয়ে গড়াগড়ি দিতে দেখেছে ! সুরা ও নারী চর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী ফল,—মারামারি, তাও এখানে নূতন দৃশ্য নয় ! খালি আহার করতে এখানে খুব কম ইংরেজ ও বাঙালীই আসে, কারণ চীনে-পাড়ার বাইরে য়ুরোপীয় ধরণের হোটেলের কোনই অভাব নেই !

'চাঙ্গুয়া'র পাশে একটি জুয়াখানা ও চণ্ডুখোরের আস্তানাও আছে। চীনে-জুয়াখানায় আমাদের প্রবেশ নিষেধ—কারণ সে কেবল চীনেদের জন্যেই। ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যে জুয়াখেলা তো পবিত্র বা ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, তাই তারা এখানে জুটলেই সেটা বে-আইনী হয় এবং পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমার বন্ধুদের প্রভাব এখানে যথেষ্ট। তাই আমি চীনে-জুয়াখানার ভিতরে একবার দৃষ্টিপাত করবার দুর্লভ সুযোগ পেলুম।... ...ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখলুম, মাঝখানে একটা বড় মেজের চারপাশে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক দাঁড়িয়ে বা চেয়ারের উপরে

যে, মেজের উপরে থাকে থাকে টাকা ও পয়সা সাজানো রয়েছে। সেই টাকা-পয়সার থাক্‌গুলো মাঝে মাঝে এ, ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে—হার-জিৎ অনুসারে। শুনেছি জুয়াখেলায় জয়লাভের চেয়ে যে অনিশ্চয়তার প্রবল উত্তেজনা আছে, সেই উত্তেজনাই ভূতের মত জুয়াড়ীদের পেয়ে বসে এবং সেইজন্যেই তারা জুয়া না খেলে থাকতে পারে না—এমন কি সর্ব্বস্ব পণ ক'রেও। ঘোড়দৌড়ের উত্তেজনায় খেলোয়াড়দের আমি পাগলের মতন হয়ে উঠতে দেখেছি। ভেবেছিলুম এখানেও সেই উত্তেজনা দেখ্‌তে পাব। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতির প্রখর আলোকেও, এই চীনেম্যান-গুলির কারুর মুখেই উত্তেজনার আভাসমাত্র আমি পেলুম না। অধিকাংশ লোকই ভাগ্যদেবীর চঞ্চল লীলা প্রশান্ত মুখে, স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ করছে—কেবল কেউ কেউ মৃদু মৃদু হাসছে—এইমাত্র! তারা কথাও কইছে খুব আস্তে আস্তে,—গলার আওয়াজেও উত্তেজনার কোন সাড়া নেই! মনে মনে ভাবলুম, হাঁ, জুয়াখেলা সত্যই চীনেদের ধর্ম্ম বটে! তাদের খেলা একমনে দেখ্‌ছি,—হঠাৎ একটা লোক ফিরে বললে, "বাবু, এ জায়গা তোমাদের জন্যে নয়!" আমরা বিনাবাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

ঠিক পাশের ঘরেই চণ্ডুখানা। সকলেই জানেন বোধ হয়, চীনে চণ্ডু আর দেশী গুলি একজাতীয় নেশা! তবে চীনেরা চণ্ডু খায় সাইকেলের 'পাম্পে'র মত একরকম পাইপে, আর গুলিখোররা ছোট একটা হুঁকায় নল লাগিয়ে। চণ্ডুখানায় তখন একজন চীনেম্যান একখানা সোফার উপরে শুয়ে ছিল, তার দেহের কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত সোফার নীচে ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এ একটা মৃতদেহ!—তার শরীরে কোথাও প্রাণের লক্ষণ নেই! নেশার ফলে সে এখন সংসারের দুঃখ-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাঞ্ছিত ও দুর্লভ বিস্মৃতিকে লাভ করেছে! চণ্ডু নাকি শুয়ে শুয়েই টান্‌তে হয়—নইলে আফিমের ধোঁয়া এত শীঘ্র মস্তিষ্কের ভিতরে

ধূমসেবন করার পরেই চণ্ডুখোর আর উঠতে বা নড়তে পারে না, তখন সে সদ্যজাত শিশুর চেয়েও অসহায়, একটা মাছি পর্য্যন্ত মারা তার পক্ষে অসম্ভব! এমন নেশাও মানুষে করে!

তারপর আমরা রাস্তায় এসে, এই আলো-আঁধারির রহস্যে ভরা, গুণ্ডার বিচরণ-ক্ষেত্র, সরু সরু গলি, জুয়াখানা, চণ্ডুর আড্ডা, মন্দির-হোটেল ও পানাগার এবং চীনে ছেলে-মেয়ে-বুড়োর জটলাতে বিচিত্র 'চায়না-টাউনে'র কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলুম। এইরকম চীনে-পাড়া পৃথিবীর সব দেশেই আছে—কারণ চীনেরা ভবঘুরে জাতি, বাঙালীর মত ঘরমুখো নয়। শুনেছি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চীনে-পাড়া দেখতে নাকি একই-রকম। আমেরিকা ও বিলাতের চীনেপাড়া নেশা, নানা পাপ ও অশান্তির জন্যে বিখ্যাত। কল্‌কাতার চীনেপাড়া ততটা ভয়ানক না হ'লেও, সাধারণের পক্ষে রাত্রে এখানে যাওয়াটা বিশেষ নিরাপদ নয়! অন্ধকার আনাচ-কানাচ থেকে যে-কোন মুহূর্ত্তেই ছোরা-ছুরির বিদ্যুৎ-চমক জ্ব'লে উঠতে পারে!

চতুর্থ দৃশ্য

গণিকা-পল্লী

কল্‌কাতার নৈশ-নাট্যের প্রধান পাত্রী হচ্ছে, বারবনিতারা। কল্‌কাতায় এমন শ্রেণীর লোক নেই বললেই হয়, বারবনিতার গৃহে যাদের আনাগোনা নেই। কল্‌কাতায় বারবনিতার সংখ্যা কল্পনাতীত—এমন কি আদম-সুমারি দেখেও তাদের সংখ্যা ধরা যায় না। কারণ এমন বারবনিতা এখানে অগুন্তি আছে, যারা

স্বরূপ বাবুদের ঘরের দাসীদের কথাই ধরুন। অনেক নীতিবাগীশ থিয়েটার দেখ্‌তে যান না এই অজুহাতে যে, বারবনিতার সংস্পর্শে আমাদে রঙ্গালয় কলঙ্কিত। কিন্তু তাঁরা দিন-রাত যাদের সংস্পর্শে আছেন, সেই দাসীরা কি ? অধিকাংশই বারবনিতা ! অনেক বাবু ঘরে ব'সেই তাদের উপভোগ করেন এবং কল্‌কাতার প্রত্যেক পাড়াতেই এমন বাবুর সংখ্যা অল্প নয় !

কল্‌কাতা সহরে বারবনিতার প্রধান আড্ডা হচ্ছে এইগুলি :—সোনাগাছি, রূপোগাছি, জয়মিত্রের গলি, আপার চিৎপুর রোড, বৌবাজার, কড়েয়া, হাড়কাটা গলি, হরি-পদ্মিনীর গলি, শেটবাগান, নতুন বাজার, মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, শশিভূষণ সুরের গলি, বেনেটোলা, গরাণহাটা, ঢাকাপটি, জোড়াবাগান ও মালাপাড়া গলি প্রভৃতি। এ ছাড়া কল্‌কাতার অধিকাংশ পল্লীতেই কম বা বেশী পরিমাণে বারবনিতা আছে—অর্থাৎ আমাদের এই সহরটি অবিদ্যার দ্বারা প্রায় আচ্ছন্ন বললেই চলে। নিশ্চয়ই কল্‌কাতার বেশীর ভাগ লোকই এদের বাড়ীতে আসে-যায়, নইলে দিনে দিনে এরা

৩৮ ব'লে মনে হচ্ছে না। অবশ্য বাঙালীর নীতিজ্ঞান এদিকে কোন কালেই বেশী কঠোরতা অবলম্বন করে নি। প্রাচীন গ্রীসের মত, দেড়শো বৎসর আগে পর্য্যন্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বারবনিতার গৃহই ছিল গ্রামবাসীদের সাধারণ মিলন-স্থান। পাড়ার বৃদ্ধেরা হরিনামের ঝুলি হাতে ক'রে অবিত্মার গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে এসে হাজিরা দিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে আস্‌ত যুবকগণও। এর মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জা বা লুকোচুরি ছিল না, কারণ সেকালে এই ব্যাপারটা নির্দ্দোষ ব'লই গণ্য করা হ'ত! নানা আলোচনায় সন্ধ্যার খানিকটা কাটিয়ে, সকলে আবার যে যার বাড়ীতে ফিরে যেত। অর্থাৎ অবিত্মার আলয় ছিল সেকালে পল্লীর প্রধান বৈঠকখানা! কিন্তু সেকালের কথা এখন থাক্‌।

কল্‌কাতার দেশী বারবনিতার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। রাস্তা বা গলির উপরে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা হচ্ছে সব-চেয়ে নিম্ন-স্তরের বারবনিতা। তারা প্রায়ই একতালা খোলার ঘরে বাস করে, অন্ধকার ও আবর্জ্জনার মধ্যে। চাকর, মুটে ও গরিব ছোট লোকেরাই তাদের রূপের উপাসক। তার উপরের স্তরের বারবনিতারা থাকে দোতালা মাঠকোটায়। মালাপাড়া গলি, ঢাকাপটি ও জোড়াবাগান প্রভৃতি পল্লীতেই এদের বাস, সাধারণত গদিওয়ালা, দোকানী ও ধনীদের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরাই এখানে আমোদের খোঁজে যায়। তারপর কোঠাবাড়ীর একতালা ঘরের বারবনিতা। তারা কিছু ভদ্র। তার উপরের স্তরে চিৎপুর রোড, হাড়কাটা গলি ও হরিপাম্নীর গলির বারবনিতা—যাদের বাস কোঠাবাড়ীর দোতালায় বা তেতালায়। সাধারণত কেরাণী প্রভৃতির দ্বারাই তাদের রূপের ব্যবসা চ'লে যায়। তার উপরের স্তরই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান স্তর। এ স্তরের মধ্যে আবার দুই দল—যারা বাঁধা, আর যারা ছুটো। বাঁধারাই সব-চেয়ে সম্ভ্রান্ত। এদের অনেকে দেড়শো থেকে তিন-চারশো টাকা পর্য্যন্ত মাসিক মাহিনা পায়।

ভোগ করে। ছুটোদের দৈনিক দর্শনী আট-দশ টাকা থেকে বিশ-পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত। যারা ভাল নাচ গান জানে, তাদের দৈনিক রোজগার আরো বেশী—সময়ে সময়ে একশো দেড়শো টাকা পর্য্যন্ত। এই স্তরে আর এক দল বারবনিতা আছে, যারা কতক 'বাঁধা' কতক 'ছুটো'। তাদের কারুর 'বাঁধা বাবু' আসে হপ্তায় নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন, বাকি দিনে সে স্বাধীন। কারুর বা বাবু আসে প্রতিদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে—বাকি সময়ে সে যাকে খুসি তাকেই অভ্যর্থনা করতে পারে। এই নির্দ্দিষ্ট কালের বাবুরা 'টাইমের বাবু' নামে বিখ্যাত। এই উচ্চস্তরের বারবনিতাদের প্রধান আস্তানা সোনাগাছি ও রূপোগাছির মধ্যে। এ স্তরের বারবনিতারা প্রায়ই নৃত্য ও সঙ্গীত কলায় বিশেষজ্ঞ। অনেকে বেশ লেখাপড়া জানে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভক্ত পাঠিকা! এরা শরীরের উপরে তেমন অত্যাচার করে না ব'লে, এদের মধ্যে পরমা সুন্দরীরও অভাব নেই। এদের আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা প্রায়ই বেশ শিষ্ট ও অশ্লীলতা-বর্জ্জিত। এই শ্রেণীর বারবনিতারা বেশী-বয়সে বড়-একটা অর্থ-কষ্টেও পড়ে না—কারণ অনেক হতভাগ্যই এদের টাকার পাহাড়ের উপরে বসিয়ে, নিজেরা কাঙাল হয়ে পথের ধূলায় বসে। তার উপরে, প্রাচীন বয়সে এদের গর্ভজাত বা পালিত কন্যারাও টাকা রোজগার করে। মেয়ের টাকায় মায়ের দিন নিশ্চিন্তভাবে চ'লে যায়। বৃদ্ধ বারবনিতারা প্রায়ই বাড়ীওয়ালী হয়।

সকল স্তরের প্রায় প্রত্যেক বারবনিতারই এক-একটি নিজস্ব মানুষ পোষা থাকে। এই অবিদ্যার প্রেমপাত্র ঘৃণিত জীবগুলোর মধ্যে ভদ্র-লোকের সন্তানেরও অভাব নেই। অবিদ্যারা রোজগার ক'রে নিজেদের [illegible]য় এদের খাওয়ায় ও জামা-কাপড় পরায়। এই নর-কুকুরগুলো প্রায়ই মাথায় চ'ড়ে বসে এবং যার পয়সা[illegible] বেঁচে [illegible]াছে নির্দ্দয়

পারে না—রূপজীবিনীর ভালোবাসাও এমন গভীর! এত সুখে থেকেও তাদের মনের-মানুষরা প্রায়ই অন্য-কোথাও উধাও হয়, তখন অনেক বার বনিতা শোকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে! এমন আত্মহত্যা এদের মধ্যে হামেসাই হচ্ছে। এই-সব ব্যাপারে বোঝা যায়, বারবনিতার হৃদয়কে আমরা যে রকম শুষ্ক মরু ব'লে মনে করি, আসলে তার অবস্থা ততটা ভয়ানক নয়। হাজার হোক্ তারাও যে মানুষ! দয়া-মায়া স্নেহ-প্রেমে তারাই বা বঞ্চিত থাকবে কেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পতিতা" কবিতায় এই কথাটি সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন—

"হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?
ছেড়েছি ধরম, তা ব'লে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই?

নাহিক করম, লজ্জা-সরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা ব'লে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি সহজ কথা?

আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসা-ক্ষুধা!
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গ-সুধা!

দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে

'পাপীকে ঘৃণা না ক'রে পাপকে ঘৃণা কর'—খৃষ্টের এ বাণী সকলেরই মনে রাখা উচিত। এই যে পাপিনীর দল, "ধরার নরক-সিংহদুয়ারে" এরা কেবল সন্ধ্যা-বাতিই জ্বালায় না, খোঁজ রাখ্‌লে দেখ্‌বেন, দেহ-দানের পাপ বাদ দিলে এদের অনেকেই 'মানুষ' হিসাবে কারুর চেয়েই খাটো হয়ে পড়বে না। কিন্তু তাদের এক পাপেই সমাজের যে যথেষ্ট অপকার হচ্ছে, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই আমাদের সহানুভূতি এখানে অন্ধ না হয়ে পারে না। এদের রূপ-মোহে সমাজে যে নিত্য-নব কত পাপের সৃষ্টি—চুরি, জুয়াচুরি, খুন-খারাপি—হচ্ছে, পুলিস-কোর্টে প্রতিদিন হাজিরা দিলে সেটা জান্‌তে আর বাকি থাকে না। মন তখন স্বভাবতই এদের প্রতি নির্দ্দয় হয়ে ওঠে।

....

সন্ধ্যা না হ'তেই চিৎপুর রোডের বারান্দায় রূপ বা কুরূপের প্রদীপ-গুলি সারি সারি বাহার দিয়ে বসে এবং রাস্তাতে গৃহাভিমুখী কেরাণীবৃন্দ ঊর্দ্ধ-মুণ্ড ব্রত গ্রহণ করে। এই ব্রত পালন করতে গিয়ে অনেকেই মাঝে মাঝে গাড়ী-চাপা পড়বার মত হয়, কিন্তু সে ধাক্কা কোনক্রমে সাম্‌লে নিয়েই ব্রত-পালকরা আবার একনিষ্ঠ ভক্তের মত বারান্দার উপরে ক্ষুধিত দৃষ্টি অর্পিত করে। ধন্য সে অধ্যবসায়, যার মধ্যে প্রাণের ভয় নেই! কে বলে বাঙালী ভীরু?... ...এই সময়েই অনেক পুরুষ-পুঙ্গব রাত্রের 'খাদ্য' পছন্দ ক'রে ফেলেন এবং তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়ে গা-মুখ ধুয়ে, সাজ-পোষাক বদ্‌লে, একটু ঠাণ্ডা হয়েই নির্ব্বাচিত খাদ্যে ছোঁ মারতে ছোটেন! চিৎপুর রোডের বারান্দা-বিপণীতে সাজানো দেহ-পণ্যের প্রধান খরিদ্দার যে মাছি-মারা কেরাণীর দল, তার জলন্ত প্রমাণ, মাসকাবারের পরের প্রথম রবিবারে প্রায় কোন পণ্যই ক্রেতার অভাবে প'ড়ে থাকে না! যত-বড় কুৎসিত স্ত্রীলোকই হোক্ না, অন্তত সে রাত্রের জন্যেও তার একজন না একজন উপাসক মিল্‌বেই মিলবে!

চিৎপুর রোডে রাত্রিতে এই বারান্দা-বিলাসিনীদের মুখ সুশ্রী কি কুশ্রী পথ থেকে দেখে তা চেনা যায় না। পুরুষরা অদৃষ্টের উপরে নির্ভর ক'রে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ে এব 'রূপসীরা'ও বাইরের বারান্দা ছেড়ে বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় এসে আপন আপন ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়ায়। তারপর দর-দস্তুর। কিন্তু মাল্ না দেখে তো দর চল্‌তে পারে না, কারণ অধিকাংশ বাড়ীর ভিতরই পূর্ণিমাতেও অমাবস্যা হয়ে থাকে! একরাত্রের হবু-'বাবু' প্রায়ই তখন এমন এক সুন্দর উপায় অবলম্বন করেন, যাতে ক'রে শ্যামও থাকে, কুলও বাঁচে —অর্থাৎ মালও দেখা হয়, চক্ষু-লজ্জাও অক্ষত থাকে! তিনি মুখে হাঁ ক'রে একটা সিগারেট গুঁজে, সেটা ধরাবার অছিলায়

দেশলাই জ্বালেন এবং তারই অস্থায়ী আলোতে সাম্‌নের রমণীটিকে যতো সম্ভব খুঁটিয়ে দেখে নেন!

সাধারণত দরদস্তুরের বাঁধা-ধরা নিয়ম এই :—

বাবু॥ কিগো, লোক বসাবে?

বিবি॥ কতক্ষণ বস্‌বেন?

কেউ বলে, এক বা দুই ঘণ্টা। কেউ বলে, সারা রাত। এক ঘণ্টা দর্শনী চার টাকা শুনলে বাবুরা হাঁকেন, দু টাকা। সারা রাতের দর্শনী দ

টাকা শুনলে বাবুরা বলেন, চার টাকা। তারপর মাঝামাঝি একটা রফা হয়। বেশী কম দর হাঁক্‌লে, "না মশাই, এখানে হবে না, খোলায় ঘরে যান"—এম্‌নি ধরণের একটা উপদেশ দিয়ে, আঁচল ঘুরিয়ে ও কোমর দুলিয়ে বিবিরা আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান।

সোনা ও রূপোগাছির ছুটো অবিন্তারা নিতান্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত অবস্থা না হ'লে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে না। প্রায়ই চেনাশুনো বন্ধুর দয়াতেই তাদের ঘর খালি যায় না। বাইরের অচেনা লোক যারা আসে, তারাও দালালের মধ্যস্থাতেই আনীত হয়। দর যা ঠিক হয়, তার চারআনা অংশ পায় দালালরা। মাঝে দালাল থাক্‌লে বাবুদের টাকাও দিতে হয় বেশী, কারণ যার দাম আট টাকা, দালালের মধ্যস্থতায় এলে তারই দাম হয় দশ টাকা। বিবির দাম বেশী হ'লে নিজের পাওনাও বেশী হবে, তাই দাম চড়াবার জন্যে দালালরা যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করে না! বিবির দেহের দামের উপরে বাবুর আর ছুটি বাঁধা খরচ আছে। চার বা আট আনার পান এবং বিবির বেয়ারাকে আটআনা বা এক টাকার বখ্‌সিস্! তার উপরে কোন কোন সুচতুরা বাবুর কাছ থেকে আজ্ঞার স্বরে আব্দার ধ'রে সে-রাতের জন্যে নিজের ও মায়ের খাইখরচটাও আদায় ক'রে নেয়। গ্রীষ্মের সময়ে রাস্তা দিয়ে ফুলওয়ালা গেলে আট আনা-একটাকার বেলের গোড়ের ফরমাজ হওয়াও খুব স্বাভাবিক। তার উপরে ট্যাক্সিতে চ'ড়ে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসবার বায়নাও আছে—তারও খরচ তিন-চার টাকার কম নয়। অধিকাংশ বাবুই বাড়ীতে কিপ্টে হ'লেও এখানে এসে একেবারে দাতা-কর্ণের নব্য সংস্করণে পরিণত হন এবং যে-সব রাতের পাখী সবে উড়্‌তে শিখেচে, তাদের হাতই দরাজ হয় সব-চেয়ে বেশী। এ পথে যারা চেনা পথিক, অর্থাৎ যাদের হাড়ে ঘুণ ধ'রে গেছে, তাদের কাছ থেকে বিবিরা বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারেন না। অবশ্য পুরাতন পাপীরা

লাগে না ; তবু সে-ক্ষেত্রেও সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয় যথেষ্ট, অর্থাৎ বিবিরা চান পকেট ছ্যাঁদা কর্‌তে, আর বাবুরা চান সন্তর্পণে তা সাম্‌লাতে। বিবিরাই কিন্তু জেতেন বেশী। বাবুর ট্যাঁক গড়ের মাঠে পরিণত কর্‌বার বিবিধ উপায় তাঁদের নখদর্পণে আছে। যথা :—বাবুর জন্যে মদের বোতল এল। বোতল যখন এল, তখন পান কর্‌তেই হবে। কিন্তু বাবু পান করেন কিসে ? বিবির ইসারায় বেয়ারা ঘরের চারিদিকে খানিকক্ষণ মিছে খোঁজাখুঁজি ক'রে ব'লে দিলে—"গেলাস সব ভেঙে গেছে !" অগত্যা বাবু নাচার হয়ে একটা বা দুটো নতুন গেলাস কিনে আন্‌বার জন্যে পকেটে হাত দিতে বাধ্য হ'লেন। ফলে আর কিছু না হোক্‌, বিবির ঘরে অন্তত গেলাসের সংখ্যা তো বাড়্‌ল বটে ! পুরাণো পাপীদের কাহিল কর্‌বার জন্যে এম্‌নি আরো ঢের ছোট-বড় উপায় আছে !

অনেকের বিশ্বাস, টাকা দিলেই অবিদ্যার ঘরে গিয়ে অনায়াসে বস্‌তে পারা যায়, তার কোন পছন্দ-অপছন্দ নেই। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা না হ'লেও, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। অধিকাংশ বারবনিতাই যাকে-তাকে ঘরে বস্‌তে দেয় না এবং বেশী টাকা কবুলালেও অচেনা লোকের সঙ্গে সারা রাত কাটাতে রাজি হয় না—অবশ্য খুব-সম্ভব, ভয়েই। তাদের মত অসহায় জীবনের তুলনা কোথায় ? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অবিদ্যারা চেহারা পছন্দ না হ'লে দ্বিগুণ মূল্যেও যে আত্মদানে রাজি হয় না, এ একেবারে খাঁটি কথা। তারা ইতর ও ভদ্রের বিচার ক'রেও লোক বসায় বা বিদায় ক'রে দেয়, ছোটলোকের ট্যাঁক ভারি থাক্‌লেও তাদের চৌকাঠ মাড়াতে পারে না।

আগেই বলেছি, অবিদ্যার চরিত্রেও মনুষ্যত্বের অভাব নেই। তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি। অভিভাবকরা খবর রাখেন না যে, কত ইস্কুলের বালক পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সেই কুস্থানে আনাগোনা করে। এ সব

এঁচড়ে-পাকা বালক আবার তাতেও তুষ্ট না হয়ে, তাদের চেয়ে সাত-আট নয়-দশ বৎসরের বয়সে বড় যুবতীদের প্রতি লোভ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রায়ই তাদের চেষ্টা বিফল হয়। বেশী টাকা দিলেও তাদের বিকৃত মনের বাসনা চরিতার্থ হয় না, বরং বকুনির চোটে তারা চট্‌পট্‌ স'রে পড়্‌তেই বাধ্য হয়।

....

....

....

সন্ধ্যা হচ্ছে রূপের দোকান সাজানো এবং দর-দস্তুরের সময়। তখন অবিদ্যা-পল্লীর বিশেষত্ব বড় ধরা পড়ে না। বাবুরাও তখন সবে এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সেছেন, আলাপ তখন জ'মে ওঠেনি এবং নেশাও মাথায় চড়ে-নি—কাজেই চারিদিক্ তখনো অনেকটা শান্ত।

কিন্তু রাত নয়টার পরেই এখানকার আব্‌হাওয়া যায় একেবারে বদ্‌লে। গেলাসে একের পরে দুই পেগ ঢাল্‌তে ঢাল্‌তেই বাবুদের চোখে দুনিয়ার রং গোলাপী হয়ে ওঠে, তিন পেগের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দেহে যেন নব-জীবনের সঞ্চার হয়! পথের দু'ধারে ঘরে ঘরে হার্মোনিয়াম, গান ও বিকট স্বরে বাহবার আওয়াজ উঠে পাড়া একেবারে সরগরম ক'রে তোলে! কোথাও বিবি ঘুঙুর প'রে, মাথায় মদের গেলাস বসিয়ে, চোখ, ভুরু, ঠোঁট ও হাত লীলায়িত ক'রে তনু দুলিয়ে নাচ সুরু করেন, বাবু হার্মোনিয়াম ধরেন, ভাড়াটে তবল্‌চী বা বাবুর মোসাহেব ঘন ঘন মাথা নেড়ে তব্‌লা বাজায়, এবং জান্‌লা বা দরজা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে পথের উপরে কাতারে কাতারে কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে যায়! ইতিমধ্যে নেশার খেয়ালে বাবুরও হঠাৎ নাচের সখ হোলো, হার্মোনিয়াম ঠেলে ফেলে এক লাফে তিনি বিবির

তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে হেঁড়ে-গলায় গান ধর্‌লেন। তার পরেই অত্যধিক ভাবের আবেগে বিবিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করবার চেষ্টা এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিবির মাথার উপর থেকে মদ-ভরা গেলাসের সশব্দ পতন!

—"ঐ যাঃ! আমার গেলাস ভেঙে গেল!"

—"যাক্ গে, তুই নাচ!"

—"হায়, হায়, আমার নতুন গেলাস!"

—"তোর নতুন গেলাসের নিকুচি করেচে—আমাকে কি তেম্‌নি বাবু পেয়েচিস্? একটা গেল—দশটা হবে! এই বেয়ারা! বেয়ারা!"

—"হুজুর" ব'লে বেয়ারার প্রবেশ!

—"নিয়ে আয় দশটা গেলাস—এই নেঃ!" একখানা দশটাকার নোট নিক্ষেপ ও মুখ টিপে হেসে বেয়ারার প্রস্থান!

—"এইবার আমার কাছে আয়, একটা—!" বিবির মুখের কাছে বাবুর মুখ এগুল।

—"আঃ, কি কর!"

—"না মাইরি, নইলে ম'রে যাব!"

—"আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়্‌লুম তো! ঘরে যে লোক রয়েচে!"

—"ড্যাম ইট্—লোক? এই, সবাই চোখ বোজ্! কী, এখনো বুজলি-নে? মার্‌ব এই সোডার বোতল ছুঁড়ে!"

তবল্‌চী, মোসাহেব ও বন্ধুরা চট্ ক'রে চক্ষু মুদে ফেল্‌লে। গোটা-কতক অস্পষ্ট শব্দ শুনে যখন বুঝ্‌লে চুম্বন-পর্ব্ব সমাপ্ত, সবাই তখন আবার ধীরে ধীরে চোখ খুল্‌লে।

—"আর একখানা গান গা ভাই!"

—"যা চ্যাচাচ্ছ, এই গোলমালে গান?"

—"না, না, এই চুপ ক'রে বস্‌লুম, আর একটা কথা কইব না!"

"কেটে দিয়ে প্রেমের ঘুঁড়ি, আবার কেন লট্‌কে ধর !
একটানেতে বোঝা গেছে, তোমার সুতোর মাঞ্জা খর !"

রাস্তায় হাঁকলে—"কুলপি মালাই কা বরফ !"

—"এই বরফ ! বরফ !"

ফের গান থেমে গেল !

বাড়ীর ভিতরে অন্য ঘরে তখন হয়তো একদল মাতাল বাবুর সঙ্গে আর কোন্ বিবি ও তাঁর মায়ের বিষম ঝগ্‌ড়া বেধে গেছে ! আর-এক ঘরে 'টাইমে'র বাবু হয়তো যথাসময়ে এসে দেখেন, তাঁর ঘরে অন্য লোক দিব্যি তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে জাঁকিয়ে ব'সে আছে ! তিনি অম্‌নি বিবির উপরে কিল-চড় বর্ষণ আরম্ভ কর্‌লেন এবং অপর বাবুটি ফ্যাসাদ দেখে তীরবেগে পলাতক হ'লেন, বাবুর গর্জ্জন ও বিবির আর্ত্তনাদে চারিদিক মুখরিত য়ে উঠ্‌ল ! তারি সঙ্গে এসে মিল্‌ল বাড়ীর অন্যান্য ঘর থেকে নানা নারীকণ্ঠের গীতধ্বনি আর হাসির হর্‌রা আর বাহবার হৈচৈ !

সাধারণত এক-একটি অবিদ্যার আলয়ে রাত্রিকালে প্রায় এই ধরণের শ্যেরই পুনরভিনয় হয় ! এরই নাম আমোদ ! এরই জন্যে বাবুরা 'গল ! অবশ্য এর ব্যত্যয় আছে। অনেক অবিদ্যার বাড়ীতে সত্যসত্যই 'চ্চশ্রেণীর নাচ-গান-বাজ্‌নার চর্চ্চা হয়, গোলমাল সেখানে নেই বা খুব ম এবং বাবুরাও শান্ত ও ভদ্র !... ...

রাত যত গভীর হয়, বিবি ও বাবুরা নেশায় কাবু হয়ে পড়েন ততই। বেল্‌চী তখন দক্ষিণা নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে. তবলা ও বাঁয়া দুটো বিছানার উপরে কাৎ বা উপুড় হয়ে প'ড়ে নীরবে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তবু বিবির গান আর কিছুতেই থামতে চাইছে না ! কিন্তু সুরাবিকৃত কণ্ঠের সেই ধ্বনি, গান না কান্না না প্যাঁচার চেয়েও বেশী-কর্কশ কোন জীবের চীৎকার, তা

চেয়ে চেঁচিয়ে উঠছেন—"কেয়াবাৎ!"... ..."তোফা"!... ..."আ ম'রে যাই!"... ..."বা-বা-বা-বা—বহুৎ আচ্ছা!"

এ-সব বাড়ীর প্রধান বিশেষত্ব—সারি সারি তাকিয়াগুলো স্বস্থানচ্যুত হয়ে বিছানার কোণে, মাঝে, আশেপাশে বা ঘরের মেঝেতে কে কোথায় বিশৃঙ্খলভাবে ঠিক্‌রে পড়েছে, শয্যার দুগ্ধ-ধবল পরিষ্কার চাদর পাণের পিকে, মাংসের ঝোলে, আধ কাম্‌ড়ানো হাঁসের ডিমে ও চল্‌কে-পড়া মদে বিচিত্র হয়ে অতি-বৃদ্ধের লোল-চর্ম্মের মত কুঁক্‌ড়ে গেছে, তারই এখানে-ওখানে বাবুর কোন কোন বন্ধু নেশায় বেহুঁস হয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে, এবং মেঝের উপরে খালি ডিস, পাউরুটির টুক্‌রো, মাংসের হাড়, পানের দোনা ও কলাপাতা এবং উপুড়-হয়ে-পড়া পিকদানী বা ডাবর সব একসঙ্গে জড়িয়ে বা ছড়িয়ে আছে! তার উপরে বাবুর এক ঘুমন্ত বন্ধু বিছানায় শুয়ে-শুয়েই, তরল ও নিরেট যা-কিছু গলা দিয়ে গলিয়েছিলেন, পেটের ভিতর থেকে হুড় হুড়্ ক'রে অত্যন্ত-হঠাৎ সে সমস্তই আবার বদন-পথে বার ক'রে দিলেন ... ...এ ভুতুড়ে উপভোগ-দৃশ্যের উপরে এইখানেই পর্দ্দা ফেলে দেওয় সঙ্গত মনে করছি!

....

....

....

অভাগিনী বারবনিতা! কি অস্বাভাবিক জীবনই তাদের যাপ করতে হয়! নিত্যই তাদের ঘরে যে-সব দুর্দ্দান্ত অতিথি আসে, তাদে অধিকাংশেরই প্রাণে দয়া বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই, তাদের উৎকট আনন্দের প্রবাহ বন্যার চেয়েও নিষ্ঠুর! কিন্তু সমস্ত নীচতা ও জঘন্যত অবিদ্যারা মৌনমুখে, মাথা পেতে সহ্য করে—বাসুকীর চেয়েও তারা সহিষ্ণু

এর আবার আছে প্রতি রাত্রেই প্রাণের ভয়! প্রায়ই ভোর বেলায় ঘরের দরজা খুলে দেখা যায়, কোন অভাগিনী বিষে বা অস্ত্রে নিহত হয়ে বিছানার উপর প'ড়ে আছে,—গত-রাত্রের বাবুদের সঙ্গে তার অর্থ ও অলঙ্কার সমস্ত অন্তর্হিত! এদের খুন করতে যাদের মায়া হয় না, তাদের বিশেষণ কি, কে জানে? আমি তাদের হত্যাকারী বলতে পারি না, তারা আরো ঢের গুরুতর পাপে পাপী—যে পাপের ধারণা করা অসম্ভব!

গণিকার মেয়ের গণিকা হওয়া ছাড়া উপায় নেই—তারা এমনতর অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করতে বাধ্য! কিন্তু যারা কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসে, মুহূর্ত্তের জন্যেও তারা যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, তবে তাদের ইন্দ্রিয়-লালসার স্বপ্ন এক নিমেষেই ছুটে যাবে। প্রথম দু-চার দিন এমন জীবন হয়তো কোন কোন বিকৃত রুচিতে সহ্য হ'তে পারে, কিন্তু তার পরেই উপভোগের বদলে আসে সুধু জীবনব্যাপী হাহাকার ও দিবা রাত্র নরক-দাহ! এমন অত্যাচারে জড় যে, সেও কেঁদে ওঠে—মানুষ তো কোন্ ছার! আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, সর্ব্বোচ্চ স্তরের সর্ব্বপ্রধান গণিকাও সুখী নয় এবং তার আত্মদানেও উপভোগ নেই। তার মুখে হাসি দেখ্‌চেন? হ্যাঁ, হাসিই বটে! কিন্তু ও-হাসির চেয়ে কান্নাও ভালো! হাসি যে এখানে দুঃখের ঘোমটা!

গণিকারা প্রায়ই যে কুৎসিত হয়, তার কারণ এই অস্বাভাবিক জীবন। এখানকার বিষাক্ত হাওয়ায় তিলোত্তমার রূপের ফুলও দুদিনে শুকিয়ে যায়। আমার চোখের সাম্‌নে কয়েকটি গৃহস্থের মেয়ে গণিকা হয়েছে। তাদের কেউ কেউ পরমা সুন্দরী ছিল। এখনো মাঝে মাঝে তাদের কারুকে কারুকে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু এখন তাদের চেহারা দেখ্‌লে ঘৃণায় মুখ ফিরাতে হয়। সব-চেয়ে সুশ্রীর রূপের পরমায়ুও এখানে এলে ফুরিয়ে যায় দুদিনে।

গণিকা-পল্লীতে এক-একটি বাড়ী আছে, যাদের নাম রাখা চলে নরক। সেখানে এক এক দল পুরুষ ও নারী নির্ম্মম এক ব্যবসা চালায়। কল্‌কাতার পথে পথে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তাদের চর ঘুরছে। তাদের কাজ চারিদিক্ থেকে মেয়ে ভুলিয়ে আনা। কল্‌কাতার পথে প্রায়ই ছোট ছোট মেয়ে হারায়। ঐ-সব বাড়ীতেই তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়। যুবতীরা কিছুদিন এখানে থেকেও যদি এদের কু-প্রস্তাবে মত না দেয়, তবে তাদের নানারকমে শায়েস্তা করা হয়। কেউ অনাহারে বন্দিনীর মত থাকে, কেউ মার খায়, তা ছাড়া আরো ঢের যন্ত্রণা আছে। অনেকের উপরেই বলপ্রকাশ করা হয়। সুরবালা ও গায়ত্রীর বিখ্যাত বিচারে এখানকার অনেক গুপ্তকথাই সকলের কাছে জাহির হয়ে গেছে। তার উপরে আর কিছু না বল্‌লেও চলে।

এই গণিকা-পল্লীগুলো যত চোর, ডাকাত, খুনে ও গুণ্ডার বিচরণ-ক্ষেত্র। তার কারণ, এখানে যে-সব রাতের পাখী স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসা বাঁধে, তারা ভরা জেবেই আসে,—খালি-পকেটের আবির্ভাব এখানে নিষিদ্ধ। এই পকেটের ভিতরে হাত চালাবার জন্যেই বদমায়েসেরা রাত্রিবেলায় এখানে আড্ডা গেড়ে বসে। কল্‌কাতার কোন না কোন গণিকা-পল্লীতে একাধিক মার-পিট, হত্যা বা রাহাজানি হয়-নি, এমন রাত্রি দুর্লভ। এখানে ভাড়াটে গুণ্ডার সংখ্যাও অগুন্তি। রমণী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা একপক্ষে নিযুক্ত হয়ে অন্যপক্ষকে আক্রমণ করে।

মধ্যে রূপোগাছিতে হামেসাই খুন-খারাপি হ'ত। কাজেই সেখানে পুলিস-পাহারার কড়াকড়ি হয় এবং এ-পাড়ার শিষ্ট ও অশিষ্ট পথিকদে— যার উপরেই সন্দেহ পড়ে, তাকেই নির্ব্বিচারে বন্দী করা হয়। গুণ্ডার ভয়েও বাবুদের ফূর্ত্তি মাটি হয় নি, কিন্তু পুলিসের সুনজরে পড়্‌বার ভয়ে তাঁরা এমন দ'মে গিয়েছিলেন, যার ফল হয়েছিল অত্যন্ত আশ্চর্য্য। এই পুলিস-

অবস্থা দেখ্‌তে গেলুম।.........বিকালে আপিস ভাঙ্‌বার সময়ে লালদীঘির রাস্তায় যে-রকম জনতা ও নানাজাতীয় গাড়ীর ভিড় হয়, রাত সাড়ে-এগারোটার সময়ে রূপোগাছির ভিতরটাও দেখ্‌তে হয় সেই রকম। কিন্তু সে রাত্রে গিয়ে দেখলুম, অবাক্ ব্যাপার! সমস্ত পথ অভিশপ্ত মরুর মত শূন্য ধূ ধূ কর্‌ছে—একখানা গাড়ী নেই, একজনও পথিক নেই, চারিদিক্ মৃত্যুর মত স্তব্ধ! কোথায় সেই পরিচিত নাচ-গান-বাজ্‌নার আওয়াজ, কোথায় সেই দশআনা-ছয়আনা চুল-ছাঁটা, পা-অবধি ঝোলানো চুড়ীদার পাঞ্জাবী-পরা, সুরা-রঙিন-চক্ষু কাপ্তেন বাবুর দল, কোথায় সেই হরেক রকমের চীৎকারে রত ফিরিওয়ালা এবং পথিকদের গায়ে-পড়া দালালের দল! সব যেন কার মন্ত্রগুণে অদৃশ্য হয়েছে!.........পথের মাঝে মাঝে খালি দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় লাঠির উপরে ভর দিয়ে লালপাগড়ীর দল—পাথরের মূর্ত্তির মত। একমাত্র তারা [illegible]র কোন জীবনের লক্ষণ নেই। পাছে আমাদেরও ধ'রে [illegible]ড়িতে বাস করবার জন্যে নিয়ে যায়, তাই আগেই সাবধান হয়ে আমরা এক জমাদারকে ডেকে, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য খুলে বল্‌লুম। পাহারাওয়ালারা আমাদের কথা বিশ্বাস করলে কি না জানিনা, কিন্তু আমাদের গ্রেপ্তারও করলে না, কেবল নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আমাদের মুখের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল বোধ করি এই ভেবেই যে,—এরা আবার কেমন সাহসী লোক, হাত-কড়ির ভয় না রেখেই এ তল্লাটে অকারণে বেড়াতে এসেছে!......

বড় রাস্তা ছেড়ে, আশপাশের সরু গলিতে—অর্থাৎ গণিকাদের প্রধান আস্তানায় ঢুক্‌লুম। সেখানকার নির্জ্জনতা আরো গম্ভীর, কারণ সেখানে আবার পাহারাওয়ালাও নেই! দুধারের উঁচু বাড়ীগুলো একান্ত স্তব্ধভাবে খাড়া হ'য়ে যেন স্তম্ভিতের মত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কোন বাড়ী থেকে একটিমাত্র আলোক-রেখা বাইরে এসে পড়েনি, প্রত্যেক জানলা-দরজা খুব সাবধানে বন্ধ করা! রূপোগাছির এমন শ্মশানের চেয়ে

শোচনীয় দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখিনি—এ যেন এক পরিত্যক্ত পল্লী, কিংবা হঠাৎ এক ভীষণ মড়কে এখানকার সমস্ত মানুষই যেন ম'রে গেছে, আর তাদের মড়াগুলো এখনো যেন প্রতি বাড়ীর ভিতরেই ঘরে ঘরে প'ড়ে আছে! একটা বুক-চাপা বোবা আতঙ্ক যেন চারিদিক্ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে এবং থম্‌থমে রাত যেন করছে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! আমার বুকটা ছাঁৎ ছাঁৎ করতে লাগ্‌ল। মাথার উপরে আচম্বিতে একটা অদৃশ্য প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ ক'রে উঠ্‌ল—ঠিক যেন প্রেতের আর্ত্তনাদ! ওঃ, সে চীৎকার সেদিন কি অস্বাভাবিকই শোনাল—আমার দেহের রক্ত যেন জল ক'রে দিয়ে গেল… … … রুদ্ধশ্বাসে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। পাশের বাড়ীর ভিতর থেকে গলার আওয়াজ পেলুম—কারা খুব চুপি চুপি কথা কইছে! সাড়া পেয়ে মনটা তবু কিছু আশ্বস্ত হোলো, কিন্তু পথের উপরে আমাদের জুতে[illegible]ব্দ শুনেই জীবনের সেই ক্ষীণ আভাসটুকুও অন্তিমের শেষ অস্পষ্ট ক[illegible] থেমে গেল!… … আর পারলুম না, তাড়াতাড়ি গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম—পাহারাওয়ালাদের কঠিন দৃষ্টির সামনে! এই প্রেত-পল্লীর মধ্যে তখন পাহারাওয়ালাদেরও দেখে আমার মনে হোলো বন্ধুর মত!

সোনাগাছিতেও পুলিস ধরপাকড় করতে ছাড়ে নি। ফলে সেখানকার জনতাও খুব পাত্‌লা হয়ে গেলেও, সে-পাড়ার অবস্থা রূপোগাছির মতন এতটা শোচনীয় হয়-নি। পুলিস যদি দীর্ঘকাল এম্‌নি সতর্ক থাকে, তবে কল্‌কাতার একটা মস্ত উপকার হবে,—অর্থাৎ রূপের ব্যবসা এখান থেকে একেবারে উঠে যাবে!

গণিকা-পল্লীতে কেবল বদমায়েসদের জন্য নয়, আরো নানা কারণে অনেক সময়ে নির্দ্দোষ লোকরাও সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে। আর এইটেই তো স্বাভাবিক! এক পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করলে অন্য পাপেরও সংস্পর্শে আস্‌তেই হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নীচে একটা

ঘটনা দিলুম ! ঘটনার যিনি নায়ক, এখন তিনি পরলোকে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁর নাম অজানা নয়। অবশ্য তাঁর আসল নাম আমি করব না।

দুই বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে খেতে ব'সে সতীনবাবু মনের খুসিতে সুরা-দেবীর প্রসাদের মাত্রাটা সেদিন কিছু অতিরিক্ত ক'রে ফেল্লেন। রাতও তখন অনেক—একটার কম নয়। এত রাত্রে এই অবস্থায় বাড়ী ফেরা অসম্ভব—বাড়ীর লোকে বল্‌বে কি ! অতএব ঠিক হোলো, সে রাতটা বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিতে হবে !

তিন বন্ধুতে টল্‌তে টল্‌তে পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন, গন্তব্য স্থান—কোন রূপসীর বাড়ী।

কিন্তু অত রাত্রে অধিকাংশ দেবীর ঘরেই পূজারী এসে হাজির হো য়েছেনই, তা-ছাড়া যাদের তখনো সে সৌভাগ্য লাভ হয়-নি, তারাও তীনবাবুর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলে না। রাত বারোটার পরে ণকারা অচেনা লোককে বড়-একটা ঘরে ঠাঁই দেয় না—বিশেষত এমন তাল অবস্থায়। কারণ, প্রাণের ভয়।

সতীনবাবু মহাবিপদে পড়লেন – ঘর ও বাহির দুই তাঁর সাম্‌নে বন্ধ। বু তিনি আশা ছাড়লেন না— পথের দু-ধারের বাড়ীতেই খোঁজ নিতে নিতে ংপুর রোডের উত্তর মুখে ক্রমশ এগিয়ে চল্‌লেন।

শোভাবাজারের কাছ-বরাবর এসে হঠাৎ দেখা গেল, একটা বাড়ীর ছাদের উপরে একটি নারী-মূর্ত্তি একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

সতীনবাবু পথের উপর থেকেই ইসারায় জানালেন, তাঁদের জন্যে ভিতরে একটু জায়গা চাই।

নারী-মূর্ত্তি হাতছানি দিয়ে সকলকে আহ্বান করলে।

সতীনবাবুরা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন। এত

সেই নারীটির ঘর। এক কথায় দরদস্তর হ'য়ে গেল। সকলে ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের বিছানার উপরে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে পড়্‌লেন।

তার পরে সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা চল্‌ল। আলাপ কিন্তু জম্‌ল না। সুন্দরী যেন কি-এক ভাবনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। আনমনার মত দু-একটা কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এই ব'লে সে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গেল—"একটু বসুন, এখনি আস্‌চি।"

সতীনবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সুন্দরী তবু ফিরল না। দু-একবার চেঁচিয়ে ডাকলেন,—কোন সাড়া নেই। তখন তিনি উঠে বাইরে বেরুতে গেলেন, কিন্তু দরজা টান্‌তেও খুল্‌ল না। বাহির থেকে দরজায় শিকল দেওয়া!

একটু আশ্চর্য্য হয়ে সতীনবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, হঠাৎ তাঁর নজর পড়্‌ল ঘরের খাটের উপরে! পা-থেকে মাথা-পর্য্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে খাটের উপরে কে শুয়ে রয়েছে। আর, চাদরে ও কিসের দাগ? সামনে ঝুঁকে প'ড়ে সতীনবাবু দেখলেন... ...রক্ত!... ... ...

তাঁর বুক যেন হিম হয়ে গেল! বন্ধু দুজনকেও ডেকে ব্যাপার দেখালেন। একজন চাদরের খানিকটা তুলেই ছেড়ে দিয়ে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলেন।

সতীনবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, কি দেখ্‌লে?"

প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বন্ধু বল্‌লেন, "মড়া! গলা কাটা!"

সকলেরই দেহে কাঁপুনি ধর্‌ল!... ...এক লহমায় সব নেশার ঘোর কোথায় উপে গেল!

অনেক কষ্টে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে সতীনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "পুরুষ, না স্ত্রীলোক!"

—"পুরুষ।"

এখন উপায়? ঘরের ভিতরে মড়া, আর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

নিশ্চয় তাঁদের বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা হয়েছে। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা উচিত নয়, অথচ পালাবার পথ নেই!

সতীনবাবু বারান্দায় ছুটে গেলেন। উঁকি মেরে দেখলেন, ঠিক পাশেই আর একটা বাড়ীর ছাদ। বন্ধুদের ডেকে, বারান্দা টপ্‌কে কোন রকমে তিনি পাশের বাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়লেন। বন্ধুরাও তাঁর অনুসরণ করতে বিলম্ব করলেন না। পরে পরে কয়েকটা ছাদ পার হ'য়ে, তাঁরা একটা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। সেটাও গণিকালয়। অচেনা লোক দেখেও কেউ কোন সন্দেহ করলে না।

পথে বেরিয়েই সকলে দেখলেন, একদল পাহারাওয়ালা ব্যস্ত ভাবে দের সুমুখ দিয়েই সেই ভয়ানক বাড়ীর দিকে যাচ্ছে! সেখানে আর কটু থাক্‌লেই সকলকে এদেরই কবলে পড়তে হ'ত!

খুব সম্ভব, খুন ক'রে আসল খুনী স'রে পড়েছে, আর নিজের গলা বাবার জন্যেই সেই স্ত্রীলোকটা এই নির্দ্দোষ লোক তিনটির ঘাড়েই সব াষ চাপাবার ফিকিরে ছিল। পুলিসে খবর পাঠিয়েছিল সে ছাড়া আর কউ নয়!

পঞ্চম দৃশ্য

নিমতলার শ্মশান

জীবনটাই প্রহসন—বিয়োগান্ত হ'লেও। যুবক-পুত্রকে শ্মশানে পাঠিয়ে বৎসর না ঘুরতেই নারী আবার গর্ভবতী হয়, এই কন্যাদায়ের দেশে সাত মেয়ের গরিব কেরাণী-বাপ স্ত্রী-সহবাস ছাড়তে পারে না, জীবকে বলি দিয়ে মানুষ জড়কে সচেতন ব'লে আরাধনা করে, আজীবন কাঙালের মত কাটিয়ে, অন্যে ওড়াবে ব'লে কৃপণ প্রাণপণে টাকা জমিয়ে যায়—ক আর নাম করব—জীবন-গ্রন্থের প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে এম্‌নি অগুণ প্রহসনের দৃশ্য! জীবনের অভিনয় শেষ ক'রে তাই অভিনেতাদের দে যখন নিমতলার চিতার আগুনে অসহায় ভাবে পুড়তে থাকে, তখন চারিদিে যে নাটকের অভিনয় হয়, তা নিতান্তই বিয়োগান্ত নয়!

নিমতলার শ্মশানে মাঝে মাঝে গভীর রাতে আমি বেড়িয়ে এসেছি —কত দিন কত রকমের বিচিত্র দৃশ্যই যে আমার চোখে পড়েছে তা আ বলবার নয়! কাশীমিত্রের ঘাটেও একবার আমি গিয়েছিলুম, কিন্তু প্রতিজ্ঞ করেছি, জীবনে আর কখনো যাব না।... ...মেডিক্যাল কলেজের গাড়ী তখন ডাক্তারের অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড অনেকগুলো স্ফীত, বিকৃত ও দুর্গন্ধ শব বহে এনেছিল, পোড়ানো হচ্ছিল সেইগুলোকেই। ওঃ, তেমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখি-নি! ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলুম, সে রাতে আর ঘুমোতে পারি নি। ভাবলে, আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!... ... ...

শ্মশানে যারা বাস করে, তাদের প্রাণ নিশ্চয় কড়া প'ড়ে কঠিন হ যায়। যে চিতায় সবেমাত্র একটা নরদেহ ভস্মসাৎ হয়েছে, দেহ

তারই উপরে হয়তো কেউ একটা ভাতের-হাঁড়ী বসিয়ে দিয়েছে! যে-চিতা একজনের দেহকে গ্রাস করলে, সেই চিতাই আর একজনের দেহ পোষণের উপায় ক'রে দিচ্ছে! মানুষ নির্ব্বিকার চিত্তে এই অন্ন গ্রহণ করবে! এ আমার ধারণায় আসে না—মানুষ হ'য়ে মানুষের মরণে এতখানি অসাড়তা! ... ...একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। মিনার্ভা থিয়েটার দেখ্‌তে গেছি। নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়েছে। একবার বাইরে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে নিতে এসেছি। হঠাৎ দেখি, রাস্তা দিয়ে একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। খাটের তলা দিয়ে একটা কালো, ন্যাংটো দেহের খানিকটা ঝুলে বেরিয়ে পড়েছে—দড়ীর বাঁধন বোধ হয় কোনগতিকে খুলে গিয়েছিল। গ্যাস ও থিয়েটারের আলো সেই দেহকে উজ্জ্বল ক'রে তুলছে! শববাহীদের প্রতিপদক্ষেপে সেটা দুলে দুলে উঠছে!... ... থিয়েটারে এসে ঢুকলুম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে চেয়ে আবার দেখতে লাগলুম সেই কৃষ্ণবর্ণ, নগ্ন, দোদুল্যমান, অর্দ্ধনির্গত শবদেহকেই। সেদিন আর থিয়েটার দেখ্‌তে পারলুম না।... ... ...মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ করলে, হাজার ধুলেও হাত থেকে সেদিন পচা মড়ার গন্ধ যায় না। সেই হাতেই তারা অনায়াসে ভাত খায়। আমি হ'লে অনাহারে মারা পড়্‌তুম। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের অধুনাগত পুলিস হাসপাতালে মিনিটখানেক শব-ব্যবচ্ছেদ দেখে, মাথা ঘুরে আমি প'ড়ে গিয়েছিলুম। তার পর কয়েকদিন আমার একরকম উপোস ক'রেই কেটেছিল। কেন জানি না, খেতে বস্‌লেই মনে পড়্‌ত সেই দৃশ্যটা—একটা মড়া হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় ও আড়ষ্ট হয়ে আছে, আর একজন লোক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার চেরা পিঠের ভিতর থেকে কি-খানিকটা কেটে বার করছে!... ... ...

নিমতলার শ্মশানে রাত্রে গিয়ে দেখেছি, হাসি আর অশ্রু সেখানে বাস করে পাশাপাশি। অন্য জাতির সমাধি-ক্ষেত্রে যে সকল গাম্ভীর্য্যের ভাব থাকে, হিন্দুর এ শ্মশানে তা নেই। আমাদের শবযাত্রাতেও তার

অভাব। খৃষ্টান বা মুসলমানের শবযাত্রায় মৃতের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব আছে, কিন্তু আমাদের তা আছে ব'লে মনে হয় না। প্রায়ই দেখি, মড়ার খাট পথে নামিয়ে শবযাত্রীরা মদের দোকানে ঢুকেছে—মদ খেতে বা মদের বোতল কিন্‌তে। অনেকে হাসিমুখে গল্প করতে করতে শব ব'হে নিয়ে যায়। আর আমাদের এই 'বল হরি, হরিবোল' ব'লে যে চীৎকার, সে তো ভয়ানক! অনেক সময়ে মনে হয়, সে যেন বিকট উপহাসের রব! হিন্দুরা প্রত্যেকেই বোধ হয় জন্ম-দার্শনিক! জীবন যখন অনিত্য, তখন মৃত্যু নিয়ে আর মাথা ঘামানো কেন?… …আমি কিন্তু মরবার আগে ব'লে যাব, আমার দেহ নিয়ে নিমতলায় যাবার সময়ে কেউ যেন অমন হরিধ্বনি না দেয়!

নিমতলার শ্মশানে গেলে দেখা যাবে, চারিদিকে মৃত্যুর দৃশ্য চূড়ে শোকের আড্ডার ভিতরে দিব্য এক নিশ্চিন্ত আড্ডা জমে আছে এ আড্ডাটা জমে ওঠে দিনের চেয়ে রাত্রেই বেশী। পুত্রহারা মা, স্বামিহারা স্ত্রী আর বাপ-মা-হারা সন্তান অশ্রান্ত স্বরে কেঁদে কেঁদে আকাশ ফাটি দিচ্ছে, কাঙাল ও ধনী, মনিব ও চাকর, পণ্ডিত ও মূর্খ, শিশু ও বুড়ো শব এখানে-ওখানে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে, দাউ-দাউ ক'রে চিতা জ্বল্‌ছে, আ কত আদরের কত যত্নের মানুষের দেহগুলো, কত সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, ক প্রতিভার আধার, কত অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, পুরুত মন্ত্র প'ড়ছে, বাল-বিধবা উন্মাদিনীর মত স্বামীর মুখে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে, কেউ চিতায় শান্তিজল ঢালছে, সদ্যঃপিতৃহীন পুত্র অশ্রু ভেজা চোখে, মুখে গঙ্গাপুত্রদের সঙ্গে তাদের প্রাপ্য নিয়ে দু-চার পয়সার জন্যে দর-কষাকষি করছে, শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে স্তব-আরাধনা ধ্বনি উঠছে, স্থানে স্থানে এক এক দল লোক ব'সে মদ বা গাঁজা খাচ্ছে উচ্চস্বরে গল্প-হাসি-মস্করা নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে, এক প্রান্তে এক সন্ন্যাসী

বুদ্ধি হারিয়ে তার ধাপ্পাবাজি শুনছে, আর একদিকে এক পাহারাওয়ালা নাচারের মত ব'সে ব'সে ঢুলছে আর পানওয়ালীর মুখের কথা ভাবছে, গঙ্গার সাম্‌নে একদল ফক্কড় ছোক্‌রা নানান রকম ইয়ার্কি মার্‌ছে, কেউ বা ঘাটের উপরে ব'সে চক্ষু মুদে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং কেউ বা মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান ধরেছে

"শ্মশান ভালো বাসিস ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি!"

এই-সব বিচিত্র দৃশ্য দেখ্‌লেই বোঝা যায়, হিন্দুর শ্মশানে দুঃখ-শোকের ভাবটাই প্রধান ভাব নয়—এমন-কি এখানকার ভাবে হট্টগোলের মাত্রাটাই যেন বেশী ব'লে মনে হয়। তোমার বুকের নিধি খ'সে পড়েছে, চোখের আলো নিবে গেছে তো এ সংসারের কি? সে যেমন চল্‌ছে তেম্‌নিই চল্‌বে —তোমার দিকে ফিরেও না তাকিয়ে! তোমার কান্না শুনে সে নিজের হাসি বন্ধ করবে না! দুনিয়ার এই কঠোর সত্যটা নিমতলায় এলেই ধরা প'ড়ে যায়।

একবার নিমতলায় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসিনী এসে বাসা বেঁধেছিল। কল্‌কাতার পথে পথে তার নাম শুনলুম—ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে তার ছবিও দেখ্‌লুম। হুজুগে-লোকগুলো দিন-কতক এম্‌নি আন্দোলন সুরু করলে যে, একরাত্রে তাকে দেখ্‌তে গেলুম। শ্মশানের ওপাশে গঙ্গামুখো হয়ে সে চুপ ক'রে ব'সে আছে—তার চেহারার প্রধান বিশেষত্ব যা চোখে পড়ল তা হচ্ছে, সে পুরুষ কি নারী চেনা অসম্ভব! কি গুণে সে এত নাম কিনেছে, তা কিছুই বুঝলুম না—তীর্থের কাকের মত যে লোকগুলো তার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তারাও যে কিছুমাত্র বুঝেছে এমনও মনে হোলো না। প্রতি পদক্ষেপে কোমর যেন ভেঙে পড়্‌ছে, চুলগুলো পিঠে এলানো, পরণে লাল টক্‌টকে কাপড়! এর হাব-ভাব চেহারায় সন্ন্যাসের কোন লক্ষণ নেই, আছে খালি কুৎসিত ভাবের লীলা। তার সঙ্গে আরো দু'চার জন লোক এল—বোধ হয় ভক্ত, অবশ্য তার যোগবলের কি যৌবনের উপাসক,

সে খবর আমার জানা নেই! নবীন সন্ন্যাসিনী এসেই পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। সে যে কি কদর্য্য ও অশ্রাব্য ভাষা তা আর কি বল্‌ব—শুন্‌লেও কাণে আঙুল দিতে হয়! প্রথমটা ঝগড়ার কারণ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, শেষে জান্‌লুম, এই নবীন তপস্বিনী এতদিন এই শ্মশানে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে ছিল, কিন্তু নূতন সন্ন্যাসিনীটির আবির্ভাবে তার পসার মাটি হবার যো হয়েছে, তাই নাকি এই বিবাদ ... ...দিন-কতক পরে আর এক রাত্রে নিমতলার শ্মশানে গেলুম নূতন সন্ন্যাসিনী তখন অদৃশ্য, কিন্তু নবীন তপস্বিনী সেখানে পূর্ণ-মহিমায় বিরাজ করছে! কতগুলো লোকের সঙ্গে সে ফষ্টিনষ্টি কর্‌ছিল। ঠিক্ বল্‌তে পারি না, তবে মনে হোলো তার চোখেও যেন সুরার রং ফুটে উঠেছে!

রাত্রে বারবনিতারাও প্রায় এখানে বেড়াতে আসে। কি দেখ্‌তে আসে, তা তারাই জানে! নিছক দেহের উপাসিকা তারা, এখানে এসে নর-দেহের এই শোচনীয় পরিণাম দেখ্‌তে তাদের ভালো লাগে? আশ্চর্য এ বিশেষত্বও ভারতে হিন্দুদের মধ্যেই সম্ভবে, অন্য জাতির বারবনিতা কখনোই এমন ব্যাপারে রাজি হবে না। তারা যে কেবল সুখের কপোতী —জরা বা মৃত্যু যে তাদের চোখের বালি!... ...গণিকারা মত্ত অবস্থায় টল্‌তে টল্‌তে ভিতরে এসে ঢোকে—সঙ্গে সঙ্গে আসে কতকগুলো মার্কা মারা লম্পট চেহারা! এখানে ঢুকেও তাদের জঘন্য ও অশ্রাব্য কামের প্রলাপ বন্ধ হয় না, এদিকে-ওদিকে ঘুরে শব-দাহ দেখে, শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম ক'রে ও প্রণামী দিয়ে তারা আবার চ'লে যায়—কলুষিত আনন্দ-বিলাসের হাসি-তামাসা গোলমালে এই শোকপুরীকে মুখরিত ক'রে।

মাঝে মাঝে গণিকার দলও গণিকার শবদেহ নিয়ে আসে। তারা আসে প্রায় অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় একখানামাত্র কাপড় প'রে। তারাও মদ খেয়ে ভর ক'রে থাকে। তাদের তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলার উচ্চ হরিবোলে রাতের

বিলক্ষণই জানে যে, সে চীৎকার শুন্‌লে মনও যেন কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ কর্‌তে থাকে। বহু লাঞ্ছনা, মনোকষ্ট, অপমান, হীনতা ও কুৎসিত ব্যাধির ভারে জীর্ণ দেহের পিঞ্জর থেকে এক অভাগীর আত্মা মুক্তিলাভ করেছে, এই মৃত্যুশীতল দেহে আর হাব-ভাব ও লালসার কোন লক্ষণ নেই! কিন্তু তার সঙ্গিনীরা এ-সব কথা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না, শ্মশান ও মানুষের শেষ-দশা দেখে তারা কিছুমাত্র দ'মে যায় না, মদ খেয়ে তারা মাতামাতি ও পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে, মৃত সঙ্গিনীর প্রতি অশ্লীল ভাষায় কৌতুক-বাণ নিক্ষেপ করে, কিংবা শ্মশানের অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ভঙ্গিভরে রসিকতা করে! এ এক বিষম অস্বাভাবিক ব্যাপার!

শ্মশানঘাটে অনেক রাত্রে ছোটখাটো সভা বসে এবং সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা থেকে সমাজ-নীতি ও রাজনীতির কথা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। ওদিকে মড়ার পর মড়া পুড়ছে, আর এদিকে নিশ্চিন্তভাবে গল্প ও তর্কাতর্কি চল্‌ছে—এ কি বিসদৃশ নয়? কল্‌কাতার প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় এক এক দল লোক থাকে, তারা পেশাদার না হ'লেও পল্লীর অনেক শব-বহনের ভার তাদের ঘাড়েই পড়ে। মৃতের জন্যে এদের মনে বিশেষ কোন শোকের ভাব থাকে না, মড়া নামিয়ে এদের অনেকেও এসে উক্ত সভায় যোগদান করে। এদের কেউ কেউ বহুকাল ধ'রে বহু মড়া ভারবহন ক'রে ক'রে এ কাজে রীতিমত পাকা হ'য়ে গেছে। এরা আবার শব-দাহের অনেক-রকমের বিচিত্র কাহিনী জানে। সে-সব কাহিনীর কোন-কোনটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও আশ্চর্য্য। এই ধরণের একটি কাহিনী এখানে দেওয়া গেল। নিমতলার শ্মশানে এক প্রবীণ শববাহীর মুখে এটি শোনা। এর সত্য মিথ্যার জন্যে আমি দায়ী নই, কিন্তু কাহিনীটির কথক একে সত্য-ঘটনারূপেই ব'লেছিলেন। তাঁর গল্প এই :—

"কল্‌কাতার এক পুরাতন পল্লীতে আমাদের বাস (পল্লীর নামও তিনি ব'লেছিলেন, আমার মনে নেই)। পাড়ায় কেউ মরলে ও তার মড়া

বইবার লোকের অভাব হ'লে তখনি আমাদের ডাক পড়ে। মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমরা পাড়ায় বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছি। এ কাজে আমাদের স্বার্থ আছে এইমাত্র, মৃতের আত্মীয়েরা সামাজিক নিয়ম-অনুসারে আমাদের একদিন আহারের নিমন্ত্রণ করে।

বছর-কয়েক আগে, একদিন রাত্রে আমরা ব'সে ব'সে গল্প কর্‌ছি হঠাৎ এক বৃদ্ধ এসে আমাদের ঘরে ঢুক্‌ল। তার মুখে শুনলুন, তার বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক মারা গেছে, কিন্তু লোকাভাবে সৎকার হচ্ছে না। বুড়োকে আমরা চিন্‌তুম না। কল্‌কাতায় পাড়ায় নিত্যই কত নতুন ভাড়াটে আস্‌ছে, সকলকে চেনা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা কোন আপত্তিই না ক'রে, তখনি কোমর বেঁধে, গামছা নিয়ে বুড়োর সঙ্গে চল্‌লুম।

পাড়ার প্রান্তে আলোকহীন এক গলির ভিতরে একটা বাড়ীতে বুড়ো আমাদের নিয়ে গেল। বুড়োর মত বাড়ীটাও অনেক বৎসরের ভারে জীর্ণ। তার ভিতরে ঘুটঘুটে কর্‌ছে অন্ধকার। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই ; ঠিক্ যেন হানা বাড়ী, ঢুক্‌লেই বুকটা ছাঁৎ ছাঁৎ করে!

একতালাতেই একটা ঘরের সাম্‌নে গিয়ে বুড়ো দরজা খুলে দিলে। ঘরের ভিতরে একটা নিবু-নিবু মাটির প্রদীপ মিট্‌-মিট্ ক'রে জ্বল্‌ছে—যেন ঘরের ভিতরে কতখানি অন্ধকার আছে তাইই ভাল ক'রে দেখাবার জন্যে! সেই আবছায়াতে দেখ্‌লুম, একখানা দড়ীর খাটের উপরে একটা মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে—উপরে তার চাদর ঢাকা! সমস্ত ঘরটা যেন মৃত্যুর কেমন একটা অস্বাভাবিক গন্ধে পরিপূর্ণ!

আমরা খাটসুদ্ধ মৃতদেহটাকে ঘর থেকে বার ক'রে আন্‌লুম, বুড়ো কিন্তু তবু ভিতরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বল্‌লুম, "কৈ মশাই, আসুন!"

বুড়ো বল্‌লে, "আমি গেলে বাড়ী আগ্‌লাবে কে?"

.স কি মশাই, আপনাদের মড়া, আপনি না এলে
১ পারি ?"

সঙ্গে বুড়ো বল্‌লে, "আচ্ছা, তবে চলুন, আমিও

মড়া নিয়ে আমরা শ্মশানের দিকে এগুলুম, বুড়ো আস্‌তে লাগ্‌ল
ামাদের পিছনে পিছনে। বিডন ষ্ট্রীটে যখন এসে পড়েছি, তখন হঠাৎ
ামার গলার উপরে টপ্‌ ক'রে ঠাণ্ডাপানা কিসের একটা ফোঁটা পড়্‌ল!
ষ্টি এল নাকি? আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, সেখানে মেঘের নাম
ন্ধও নেই। অবাক্ হ'য়ে ভাবছি,—আবার একটা ফোঁটা! নিশ্চয় খাট
থকে কি পড়্‌ছে!... ...কিন্তু কি পড়্‌ছে?

প্রাণটা কেমন অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল! সঙ্গীদেরও ডেকে ব্যাপারটা
ল্‌লুম। তার পর একটা গ্যাসপোষ্টের কাছে গিয়ে যা দেখ্‌লুম, তাতে
া-দুটো যেন পক্ষাঘাতে হঠাৎ আড়ষ্ট হ'য়ে গেল! রক্ত, রক্ত,—মড়ার চাদর
ইয়ে এ যে রক্তের ফোঁটা ঝর্‌ছে! কিসের রক্ত এ?

তাড়াতাড়ি পিছন দিকে চাইলুম—কিন্তু বুড়োকে আর দেখ্‌তে পেলুম
া! কোন্ ফাঁকে সে স'রে পড়েছে!

এখন উপায়? যাকে বহে নিয়ে যাচ্ছি, তাকে কি কেউ খুন করেছে?
থের মাঝে চাদর খুলে দেখ্‌তেও ভরসা হোলো না—যদি আর কারুর
াথে প'ড়ে যায়? সকলেই কাঁধে খাট নিয়ে স্তম্ভিতের মত সেখানে
ড়িয়ে রইলুম—না পারি এগুতে, না পারি পেছুতে! মড়া নিয়ে উল্টো
থে আবার পাড়ার দিকে ফিরে গেলেও লোকে সন্দেহ কর্‌বে, এগুলেও
শানে গিয়ে ধরা পড়্‌ব!

একজন বল্‌লে, "এস, আমরা এখানেই খাট ফেলে যে যে-দিকে পারি
টনে লম্বা দি!"

আমি বল্‌লুম, "তাহ'লে এখনি ধরা পড়্‌ব
পাহারাওলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখ্‌চে!"

বুকটা টিপ্‌ টিপ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, তবু প্রাণপণে আন
পাহারাওয়ালার চোখের সাম্‌নে দিয়ে যাবার সময়ে আমাদের মনে
যে কি-রকম কর্‌ছিল, তা আর খুলে বলবার নয়! যা হোক, পাহারাওয়া
কিছু বল্‌লে না। উপস্থিত বিপদ থেকে তো রক্ষা পেলুম, কিন্তু শ্মশা
গিয়ে কি হবে? সেখানে তো এই রক্তাক্ত লাস সকলের সুমুখে ফাঁ
দিয়ে পুড়ানো যাবে না! বাঁচবার আর কোন উপায় নেই!

ঠিক যেন ভূতগ্রস্তের মত আচ্ছন্ন অবস্থায় নিমতলার শ্মশানে এ
পড়লুম। রাত তখন অনেক। প্রতি পদে মনে হ'তে লাগ্‌ল, আম
এক-পা এক-পা ক'রে সাক্ষাৎ ফাঁসী-কাঠের দিকে এগিয়ে চলেছি!

মরিয়া হ'য়ে শ্মশানের ভিতরে ঢুক্‌লুম। কোন দিকে না চেয়ে, শ্মশানে
যে-অংশ গঙ্গাঘাটের দিকে, একবারে সেইখানে গিয়ে পড়্‌লুম। খ
নামিয়ে, মড়া-ঢাকা চাদরের একপাশ একটু কোনরকমে তুলে দেখলুম,
ভেবেছি তাই! এই স্ত্রীলোকটাকে কেউ খুন করেছে!

আমাদের কপাল-গুণে শ্মশানের এ অংশটা সেদিন নির্জ্জন ছিল
আমরা আর এক সেকেণ্ড দাঁড়ালুম না, লাসসুদ্ধ খাট সেইখানেই ফে
রেখে, সকলে চুপি চুপি গঙ্গায় গিয়ে ঝপাঝপ্‌ ঝাঁপিয়ে পড়লুম, তার প
একেবারে এক সাঁতারে অনেক তফাতে এসে উঠলুম!... ... ...

পাড়ায় এসেই সেই বাড়ীর দিকে ছুটলুম। বাড়ী খালি! বুড়োকে
আর চোখে দেখি নি।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

হোটেল

কল্‌কাতার নৈশ দৃশ্যে হোটেলের ছবি বাদ পড়তে পারে না, কারণ হোটেলে খাওয়া সখের বাবুদের একটা আধুনিক ফ্যাসন বা ঢং।

কল্‌কাতায় হোটেল আছে নানা শ্রেণীর, কিন্তু সে সমস্তেরই কথা খানে আলোচনা ক'রে লাভ নাই। কারণ সাধারণত "হিন্দু হোটেল বা লোকদিগের আহারের স্থান" ব'লে যেগুলি বিখ্যাত, সেগুলির মধ্যে নীয় বিশেষত্বের একান্ত অভাব। গরিব বাসাড়ে ভদ্রলোক বা গদীর কুরে দলের লোকেরাই সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে এবং সে দৃশ্য নিতান্ত কথেয়ে। অনেক চায়ের দোকানেরও আজকাল 'হোটেলত্ব'-প্রাপ্তি ঘটেছে, হস্ত বড় জোর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাদের পরমায়ু, আর স্কুল-কলেজের ছাত্র দরিদ্র কেরাণীরাই মুরুব্বি হয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। আর এক শ্রেণীর টেল বড় বড় জম্‌কালো আর ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ইংরেজী বা ফরাসী নাম য়ে পথে পথে—বিশেষত বাংলা থিয়েটারের আশে-পাশে বিরাজ করে। ক-একখানা একতালা ঘরেই এ সব হোটেল সীমাবদ্ধ। এখানে রান্না া ও খাবার সাজানো থাকে পথের ধারেই এবং রাস্তার যত ধূলো, নোংরা গ্রালের টুক্‌রো ও কীটপতঙ্গ উড়ে এসে খাবারের উপরে পড়ে। এখানকার য়ারারা রাধাবাজারের দোকানদারের মত গলাবাজির দ্বারা এই সব বিষবৎ বার খেয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করে। এখানে খের বাবুরা ভুলেও পায়ের ধূলো দেন না। আর্সোলা যেমন পাখী নয়, গুলোও তেমনি আসলে হোটেল নয়, চল্‌তি ভাষায় এদের নাম হচ্ছে,

'চাটের দোকান'। অবশ্য এরি মধ্যে দু-চারটে আসল হোটেলের ক্ষুদ্র সংস্করণও আছে—কিন্তু সেগুলোও অত্যন্ত প্রকাশ্য ব'লে রহস্য-বর্জ্জিত।

কল্‌কাতায় দেশী পাড়ায় খুব বড় হোটেল না থাকলেও, মাঝারি দরের হোটেলের সংখ্যা বড় কম নয়। অবশ্য রূপে গুণে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এর অধিকাংশগুলি সাহেব-পাড়ার ক্ষুদ্রতম হোটেলেরও সমকক্ষ নয়, কিন্তু এখানে খরিদ্দারের অভাব হয় না। এ-সব হোটেলের কোন-কোনটি ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য এবং কোন-কোনটির ভিতরে গেলে দেখা যা মালিকের যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের অভাব না থাক্‌লেও, রুচির অভা একান্ত। ঘরদ্বার সাজানো গুছানো হয়েছে যথেষ্ট—কিন্তু সবই যে মাড়োয়ারী আদর্শে—অর্থাৎ আর্ট নেই, বাহুল্য আছে।

দিনের আলোয় এ-সব হোটেলের বিশেষত্ব কিছুই নজরে পড়ে কারণ গণিকাদের মত এদেরও ঘুম ভাঙে ও জীবন সুরু হয় সন্ধ্যার স সঙ্গে। তখন এদের ঘরে ঘরে বিজ্‌লী-বাতি জ্ব'লে ওঠে ও বন্‌ বন্‌ ক' বিজ্‌লী-পাখা ঘুরতে থাকে এবং আগাগোড়া যথাসাধ্য সাজিয়ে গুছিয়ে রা হয়। বাঙালীর হোটেলে খাওয়ার সঙ্গে গণিকালয়ে গমনের সম্পর্ক কি ঘনিষ্ঠ, তাই সোনাগাছি অঞ্চলেই হোটেলের সংখ্যা বেশী। এ অঞ্চ বারবনিতা ছাড়া আর দুটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, হোটেল আর পানে দোকান।

দেশী পাড়ার হোটেলে কর্ত্তৃপক্ষ 'বার' রাখতে দেন না—যদিও কার্য্য দরে-দরে হাঁটুজলই দাঁড়িয়ে গেছে। সোনাগাছি অঞ্চলে হোটেলওয়ালাদে সব-চেয়ে বড় অতিথি হচ্ছেন সুরা-সেবকরা এবং অনেক হোটেলে লুকি মদ বিক্রী যে অবাধে চলে না, তাও জোর ক'রে বল্‌তে পারি না। হ তো হোটেলে প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন দেখবেন "ভিতরে মদ লইয়া প্রবে নিষেধ", কিন্তু অন্দরে ঢুকে ঘরে ঘরে উঁকি মারলেই নজর পড়্‌বে একাধিক মদের বোতল ক্রমেই খালি হয়ে আস্‌ছে! অনেক হোটে

মদ বিক্রী হয় না বটে, কিন্তু ভিতরে ব'সে অন্তত মদ্য পান করতে না।
এ অঞ্চলে হোটেল চলা অসম্ভব। এখানকার অধিকাংশ খরিদ্দারই যখন
াতাল, তখন হোটেলওয়ালারা দায়ে প'ড়েই এদিকে অন্ধ হ'য়ে থাকে এবং
এজন্যে তাদের বড় দোষী করতেও পারা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ হোটেলে
ারে'র বিরোধী, কিন্তু মদ বিক্রীর লুকানো আড্ডা এখানে যথেষ্ট, মাঝে
ক লোকসান দিয়ে মরে খালি মাতাল বেচারীরাই। কারণ রাত
টটার পরে মদ কিন্তে হ'লেই প্রত্যেক পাঁইটে তাদের এক এক
কা ক'রে বেশী দিতে হয়।

থিয়েটারের আশেপাশে যত হোটেল আছে, তার মধ্যে সব-চেয়ে পরিষ্কার-
রিচ্ছন্ন ও সাজানো-গুছানো হোটেল হচ্ছে বিডনষ্ট্রীটের "মিনার্ভা
স্তোরাঁ"। এখানকার রান্না ও খাবার গুণে বাঙালী-পাড়ার সব হোটেলের
য়েই ভালো। "মিনার্ভা রেস্তোরাঁ"র খরিদ্দাররা প্রায়ই বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত
ণীর লোক। অবশ্য সুরাভক্তরা এক বিষয়ে হতাশ হবেন,—এখানে
াপনে মদ বিক্রী হয় না।

সোনাগাছি অঞ্চলে হোটেলে খরিদ্দার আসে, প্রধানত দুই সময়ে।
্যার পরে বাবুরা যখন সুন্দরী শিকারে বাহির হন, তখন প্রায়ই আগে
টেলে এসে ওঠেন। কিছু মাংস ও সুরার বোতল নিয়ে ব'সে প্রথমতঃ
রা 'ধাতস্থ' হন। সেই সময়ে পরামর্শ হয়, কোন্ দিকে গেলে ভালো
কার মিল্‌বে। তার পর আর এক শ্রেণীর খরিদ্দার আসে কিছু বেশী
তে—একেবারে যুগল রূপে অর্থাৎ শ্রীমান্ ও শ্রীমতীতে একসঙ্গে।
াহেবী হোটেলে ভদ্র নারী-অতিথির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু দেশী-
ড়ার কোন হোটেলেই ভদ্র মহিলারা পদার্পণ করেন না। কাজেই
রিঙ্গীদের দেখাদেখি বাবুরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান্! অবিদ্যাদের
ত হোটেলওয়ালাদেরও খরিদ্দারের সংখ্যা সব-চেয়ে বেশী হয়, মাসকাবারের
াথম শনিবারে। আরো এক বিষয়ে হোটেলের মালিকদের সঙ্গে

...দের মিল আছে। তাঁদেরও ব্যবসা পরের মন যুগিয়ে চলা, সকলকে মিষ্ট কথায় বশ রাখা এবং হরেক-রকম অত্যাচার হাসিমুখে গায়ে মাখা!

সোনাগাছি অঞ্চলে হোটেলের সাধারণ নৈশ অভিনয় এই রকম। একদল বাবু খেতে এলেন। হোটেলের মালিক তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। বাবুরা একটি ঘরে গিয়ে বস্‌তে না বস্‌তে বেয়ারা এসে হাজির। তখনি প্রথমে কিছু 'ড্রাই' খাবার, এক বোত... হুইস্কি বা ব্রাণ্ডী, খানিকটা বরফ ও কয়েক বোতল সোডার হুকুম হোলো। বেয়ারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল করলে।

প্রত্যেকের গেলাসে যখন মদ ঢালা হচ্ছে, একজন আপত্তি জানি... বল্‌লেন, "না ভাই, আজ আমায় মাপ কর!"

—"তাও কি হয়?"

—"না, না, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, বাড়ীতে ... মুখে গন্ধ পাবে!"

—"ইস্‌, ভারি যে 'গুড বয়' দেখ্‌চি, ও-সব সতীত্ব এখানে চল্‌বে না!

—"না হে, তুমি বুঝচ না! গিন্নি যদি টের পায়, তখনি গলায় দ... দেবে, কি আফিম খাবে, কি কেরাসিনে পুড়ে মরবে!"

—"আপদ্‌ যাবে! ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে—ভয় কি দাদা? না বেসুরো গেয়ে স্ফূর্ত্তি মাটি ক'রে দিও না!"

এক এক পাত্র খালি হোলো, গেলাসে আবার মদ ও সোডা পড়্‌ল... প্রথমে যিনি আপত্তি করেছিলেন, এবারেও তিনি আপত্তি করলেন বটে কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গে নয়। তৃতীয়বারে তিনি মোটেই আপত্তি করলে না, এবং চতুর্থ বারে নিজেই বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে নিলেন মাতালের মনোবিজ্ঞান এম্‌নি বিচিত্র! বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পেলে বে...

নেশা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের গলার আওয়াজও ক্রমে উঁচু চড়্‌তে লাগ্‌ল। তখন তাঁদের কথাবার্ত্তার মুখ্য বিষয় কি, সেটা স্থির ক'রে বুঝে ওঠা শক্ত কথা। কখনো আপিসের বড়বাবু বা সাহেবের কথা, কখনো নিজের নিজের স্ত্রীর কথা, কখনো বাপ-মায়ের অত্যাচারের কথা এবং তারি মাঝে মাঝে 'বোয় !' ব'লে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার, আরও খাবারের ফরমাজ বা টেবিল চাপ্‌ড়ে এক আধ লাইন গান !

তার পরে গন্তব্যস্থান স্থির করা।

একজন বললেন, "চল্, আজ ডালিমের বাড়ী যাই !"

—"না, সে বেটীর গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না, ট্যাঁকের কড়ি ফেলে অ: ত গুমোর সইতে রাজি নই !"

আর-একজনও আপত্তি জানিয়ে বল্‌লেন, "না, না, সাম্‌নেই পূজো, এর মধ্যে আমি আর তার চৌকাঠ মাড়াচ্ছি না—এখনি বিষম এক বায়না ধ'r .র বস্‌বে !"

—"ধরুক বায়না ! এমন চোখ আর এমন হাসি অন্য কোথায় পাবে ?"

—"তোর চোখের আর হাসির নিকুচি করেচে, টাকা ফেললে বাঘের দুধ মেলে, চোখ আর হাসির কথা কি বল্‌চিস ?"

ডালিমের ভক্ত ভোটে হেরে ফোঁস্ ক'রে এক নিশ্বাস ফেলে গেলাসে ফে: র মদ ঢাল্‌তে প্রবৃত্ত হলেন।

—"তার চেয়ে চীনে-চামেলীর বাড়ীতে চল, নাচে-গানে মন মাৎ ক' রে দেবে !"

—"দরেও সস্তা—"

—"ভদ্রলোকের কদর বোঝে !"

—"কিন্তু ডালিম—"

—"ফের ডালিমের নাম মুখে এনেচ কি সোডার বোতল তোমার মাথায় ভে ঙেচি !"

—"বোয়, বোয়! বিল লে আও!"………

কোন্ বাগানে চীনে-চামেলী ফুটে আছে, বাবুরা সেই খোঁজে বেরুলেন।
……খানিক পরে আর একদল ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত এসে হোটেলের আর
এক কামরা দখল করলে। এ দলে চারজন পুরুষ, দুই'জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক
দুটি কাপড়-জামা পরেছে ব্রাহ্ম-মহিলাদের নকলে। মাথায় এক একখানা
কাপড় বাঁধা—নব্য-তন্ত্রের মেয়েদের এ এক নতুন ফ্যাসান। তাঁদের দেখা-
দেখি এরাও শিখেছে। দুজনেরই চোখে চশমা ও পায়ে সোনালী লপেটা।
অনেক গণিকাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখলেই শিক্ষিতা নব্য মহিলা ব'লে ভ্রম
হয়, এমন সুকৌশলে তারা আত্মগোপন করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
গহনা, নাকের নাকছাবি ও পায়ের সোনালী জুতো তাদের আসল স্বরূপ
ধরিয়ে দেয়।

নূতন দলের সকলেই ইতিমধ্যে যথেষ্ট মদ্যপান ক'রে এসেছে, কিন্তু
তাতেও তাদের তৃপ্তি হোলো না, কারণ এখনো তারা যে চ'লে-হেঁটে বেড়াতে
পারছে! এসেই 'মদ, মদ' রব উঠল, একজন অম্‌নি পকেট থেকে হুইস্কির
একটি ছোট বোতল বার ক'রে টেবিলের উপরে রাখলে। তখনি তিন
বোতল সোডা ও এক চাঙাড় বরফ এল এবং পান সুরু হোলো। নেশার
উপরে নেশার প্রভাব আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ফুটে উঠল! একজন হঠাৎ একটি
স্ত্রীলোককে জড়িয়ে ধ'রে ঢুলু ঢুলু চোখে বল্‌লে, "আঙুর, তোকে বড্ড
ভালোবাসি!"

অম্‌নি বাকি তিনজন পুরুষও তার স্বরে প্রতিধ্বনি ক'রে উঠল,
"আঙুর, তোকে বড্ড ভালোবাসি!"

—"থাক্, থাক্, আমার জন্যে শেষটা কি তোমার গিন্নী নিরমিষ্যি খাবে,
সিঁদুর মুছে ফেল্‌বে? প্রাণ টান কিছু তোমাকে দিতে বল্‌চি না ইয়ার,
তার চেয়ে আমাকে একটা মুক্তোর 'কলার' কিনে দাও দেখি। আজ্ঞ'রে ...

প্রথম প্রেমিক সে কথা যেন শুন্‌তে পায়নি, এম্‌নি ভাব দেখিয়ে অন্য স্ত্রীলোকটিকে বল্‌লে, "হেনা, একখানা গান গা' না ভাই!"

হেনা বল্‌লে, "হোটেলে ব'সে গান গাইব কি গো!"

—"আলবৎ গাইবে!"

হেনা মাতালদের আর না ঘাঁটিয়ে গুন্‌গুন্ ক'রে গাইলে,

"দিদি, লালপাখীটা আমায় ধ'রে দে না রে!"

একজন টেবিলকে তবলায় পরিণত ক'রে তাল দিতে লাগ্‌ল, আর-একজন দুটো খালি কাঁচের গেলাস নিয়ে টুং টুং ক'রে খঞ্জনীর বোল ধরলে এবং সেই প্রাণবিসর্জ্জনে উদ্যত প্রেমিক বাবুটি দাঁড়িয়ে উঠে নাচ্‌তে গিয়ে মেঝের উপরে ট'লে প'ড়ে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। বাজাতে বাজাতে হঠাৎ একটা গেলাস ভেঙে কাঁচের টুক্‌রোগুলো প্রেমিকের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়্‌ল, কিন্তু যে ভাঙ্‌লে, যার গায়ে পড়্‌ল, আর যারা দেখ্‌লে, তাদের কেউই এজন্যে এতটুকু ব্যস্ত হওয়া দরকার মনে করলে না!

আচম্বিতে সিঁড়ির উপরে একটা প্রবল হাসি-গানের হর্‌রা শোনা গেল,—একসঙ্গে বারো-তেরো জন স্ত্রীলোকের গলা!... ...এ-ঘরের গাইয়ে, বাজিয়ে ও শুনিয়েরা অম্‌নি তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে, পরে পরে একঝাঁক কালো, ফর্সা ও শ্যাম্‌লা পরী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে—কিন্তু এ নারীর দল একেবারে পুরুষবর্জ্জিত!

আঙুর বল্‌লে, "মাতাল হরি!"

'মাতাল হরি' কল্‌কাতার এক নামজাদা মেয়ে-কাপ্তেন! তাকে দেখতে মোটেই ভালো নয়, কিন্তু গান গেয়ে সে রাশি রাশি টাকা রোজগার করে এবং দু-হাতে তা খরচ ক'রে ফেলে। তার একটি অদ্ভুত বাতিক আছে। টাকা পেলেই সে দিন-কতক ব্যবসা বন্ধ ক'রে দেয় এবং চেনা-শুনো আরো জনকতক স্ত্রীলোককে নিয়ে ঘরে-বাইরে ফূর্ত্তি ক'রে বেড়ায়! যতদিন তার হাতে টাকা থাকে, ততদিন তার ফূর্ত্তি চলে—এ আমোদের

মধ্যে কোন পুরুষ-বন্ধুকে প্রায়ই সে ডাকে না! দিন রাতই সে মদ খায় —সেইসঙ্গে গাঁজা-গুলি-চণ্ডুও নাকি বাদ যায় না! আমাদের 'মাতাল হরি' নামটা যদিও কাল্পনিক, আসল লোক কিন্তু সত্যই আছে!

মাতাল হরি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একটা বড় ঘরে বাহার দিয়ে ব'সে গেল—সমস্ত হোটেল তাদের স্ত্রী-কণ্ঠের হট্টগোলে ভ'রে উঠল! হোটেলের মালিকের মুখ আজ ভারি খুসি! মাতাল হরির মতন খরিদ্দারের আবির্ভাবে তাঁর হোটেলের সমস্ত খাবার যে আজ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই! তিনি তাড়াতাড়ি উপরে এসে, একগাল হেসে বল্‌লেন, "কি চাই ভাই হরি, ফরমাজ কর!"

হরি বললে "ব্রাদার! তুমি থাকতে আমি অর্ডার দেব কি-রকম? আমাদের যা চাই, তুমিই ব'লে দাও, আর আমাদের সঙ্গে এইখানেই ব'সে যাও, তোমাকেও ছাড়চি না বাবা!"

দেখতে দেখতে মদের বোতল, সোডার বোতল, গেলাস, বরফের পাত্র ও খাবারের ডিসে টেবিলগুলো পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল,—বেসুরো গান, খিল্‌-খিল্‌ হাসি, ধেই-ধেই নাচ, ঝন্‌-ঝন্‌ ডিস ও গেলাস ভাঙা, অশ্লীল চীৎকার ও অশ্রাব্য কথায় সেখানে কাণ পাতে কার এমন সাধ্য! হোটেলে নূতন খরিদ্দার এসে ব্যাপার দেখে অনেকে স'রে পড়ল, যারা এতেও ভড়্‌কালে না, মাতাল হরি তাদেরও কারুকে কারুকে নিজের দলে টেনে নিলে! আঙুর ও হেনাও ইতিমধ্যে মাতাল হরির দলে যোগ দিয়েছে, কিন্তু তার পুরুষ-বন্ধুরা ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে পিঠটান দিয়েছে —এমন ব্যাপার তো তারা কখনো দেখে নি! কেবল প্রেমিকটি তখনো আত্মনিবেদনের সুযোগ ছাড়ে-নি, খানিক পরে কাঁচের বিছানা ছেড়ে উঠে, হামাগুড়ি দিয়ে সে আঙুরের পাশে এসে বসেছে এবং মাঝে মাঝে আঙুরকে ভালবাসার ভাব দেখাচ্ছে।

হোটেলে এরকম দৃশ্য নূতন বটে, কিন্তু আঙুর ও প্রেমিকের মতন

লোক কল্‌কাতার সোনাগাছি অঞ্চলের অধিকাংশ হোটেলেই দেখা যায়।

মালিক দুর্দ্দান্ত না হ'লে এ অঞ্চলে হোটেল চালাতে পারে না। অধিকাংশ খরিদ্দারই যেখানে মাতাল, সেখানে সকল রকম বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা আছে এবং তা ঘ'টে থাকেও। সেখানে শান্তিরক্ষা করা ভালো মানুষের কাজ নয়।

এ-সব হোটেলে রান্নাও সাধারণ রুচিসঙ্গত নয়। মাতালরাই এখানে আনাগোনা করে এবং তারা ঝাল ভালোবাসে। এখানকার খাবারও তাই বেশ ঝাল হয়। আবার এক একটা হোটেলে খাবারে এত ঝাল দেওয়া হয় যা, মদে অজ্ঞান না হয়ে থাক্‌লে গলাধঃকরণ করা অসম্ভব।

এ-সব হোটেলের খাবারও যে ভালো, তা নয়। প্রায়ই খাবারে ভেজাল থাকে। ঘি খারাপ, অনেকে আবার বাদামী তেলও ব্যবহার করে। আজ্‌কের মাংস বাঁচলে, কাল তার সদ্ব্যবহার হয়। সস্তা ব'লে ছাগের নামে গরুর মাংস চালিয়েও কোন কোন হোটেলওয়ালা ধরা পড়েছে। মাতালদের জ্ঞান থাক্‌লে কল্‌কাতার অধিকাংশ হোটেলই আজ খরিদ্দারের অভাবে উঠে যেত।

সপ্তম দৃশ্য

কল্‌কাতার উৎসব রাত্রি

চারিদিকের চরম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও কল্‌কাতা যখন হাসে, তখন প্রাণ ভ'রেই হাসে। কিন্তু দিন-কে-দিন এ হাসি শুকিয়ে আসছে। আমাদের শৈশবেও উৎসবরাত্রে কল্‌কাতার যে প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখেছি, এখন আর তেমনটি দেখি না। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার ও এখনকার পূজা-পার্ব্বণের মধ্যে প্রভেদ আছে আকাশ-পাতাল। এবং এ প্রভেদের প্রধান কারণ, তখন অল্প টাকায় আমোদ হ'ত বেশী, এখন বেশী টাকাতেও উৎসবের আনন্দ পাওয়া যায় অল্প। দুঃখীর সংখ্যা চিরদিনই বেশী থাকে, কিন্তু এখন ধনীর সংখ্যা ক'মে গেছে। বিশেষ, নূতন ধনীদের প্রাণও সেকালের ধনীদের মত দরাজ নয়। সেকালের ধনীরা নিজেরা খুসী হয়েই তুষ্ট থাকতেন না, তাঁরা দশজনকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন। একালের ধনীরা নিজেরাই খুসি হ'তে চান বেশী, আর দশজনের জন্যে তাঁরা বড় মাথা ঘামান না।

কল্‌কাতার প্রধান উৎসব হচ্ছে, দুর্গাপূজা—মুসলমানদের যেমন মহরম। কিন্তু দুর্গা-প্রতিমার সংখ্যা এখন ক্রমেই অল্প হয়ে আসছে। বৎসর সাত-আট আগেও দুর্গাপূজার উৎসবে পাথুরে-ঘাটাই কল্‌কাতার আর-সব পল্লীকে টেক্কা দিত; অবশ্য এখনো একমাত্র পল্লীতে এত বেশী প্রতিমার সংখ্যা কল্‌কাতার আর কোথাও দেখা যায় না। ভাসানের দিন আগে পাথুরে-ঘাটার পথ লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকৃত—কারণ এখানে প্রায় একসঙ্গে অনেকগুলি প্রতিমার শোভাযাত্রা বাহির হ'ত এবং সে একটা দেখবার মত দৃশ্য ছিল।

দুর্গাপূজার কয় রাত্রেই পাথুরে-ঘাটায় যেন জনতার প্রবাহ ব'য়ে যেতে থাকে—লোকের পরে লোক, তারপরে লোক, আনাগোনার আর বিরাম নেই। আলোক-মালায় পথ সমুজ্জ্বল, ঢাক ঢোলের ও নহবতের উৎসবোল্লাস-জাগানো ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত, সকলেরই মুখে হাসি, পরোণে নূতন কাপড়! পূজো-বাড়ীগুলিতে এ সময়ে সকলেরই অবাধগতি এবং সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দলে দলে লোক প্রতিমা দর্শন ক'রে যায়। ভিড়ের ভিতরে নারীর সংখ্যাও যথেষ্ট। অনেক গরীব ভদ্রলোকের মেয়েও প্রতিমা দেখ্‌তে আসে, আর গণিকার তো কথাই নেই। ভিড় হচ্চে গণিকাদের বড় প্রিয়, কারণ তাতে শিকার-সংগ্রহের সুবিধা বেশী। তাই তারাও পুরুষ বধ করবার জন্যে যথাসাধ্য মারাত্মক সাজসজ্জা ক'রে জনতার মধ্যে ক্রমাগত যাতয়াত করে। ভিড়ের ভিতরে গুণীর অভাব কখনো হয় না; এবং সেই জনতায় গুণীও আছে নানাশ্রেণীর। কেউ আসে খালি সৌন্দর্য্য-দর্শনে। গণিকা থেকে সুরু ক'রে ভদ্রমহিলার ঘোমটার মধ্যে এবং পূজাবাড়ীর অন্দর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ হয়ে থাকে—উল্লেখযোগ্য সুন্দর মুখ দেখেছে কি তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে! এ শ্রেণীর গুণীরা অসভ্য হ'লেও নিরাপদ। কেননা দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন এদের আর বেশী দূর অগ্রসর হবার সাহস নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণীরা দর্শন ও স্পর্শন দুইই চায়। তারা সব-চেয়ে-বেশী ঘটায় পূজোবাড়ীর ফটকের সাম্‌নে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করে। ভদ্র-অভদ্র দলে দলে নারী আসছে আর যাচ্ছে। মনের মত মুখ দেখলেই তারা দলের ভিতর ঢুকে পড়ে। বাড়ীর সদর দরজা পার হয়েই সাধারণত একটা সঙ্কীর্ণ পথ থাকে। জনতায় তার ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি ও গায়ে পড়াপড়ি অনিবার্য্য। গুণীরাও তাই চায়! কারণ এই সুযোগে মন-মজানো চেহারার স্পর্শলাভে তাদের সর্ব্বশরীর পুলকিত হয়ে উঠে। নারীদের সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভিতরে ঢোকে এবং

সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে আসে। তারপর আবার নূতন দলের অপেক্ষায় ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর গুণীরা আরো বেশী অগ্রসর। তারা এই সুযোগে কুলবধূর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর গুণীরা আসে গণিকা-নির্ব্বাচনের জন্যে—সাধারণের পক্ষে তারাও নিরাপদ। পঞ্চম শ্রেণীর গুণীরা রূপচর্চ্চার কোন ধার ধারে না। ছোট ছোট মেয়েরা ঠাকুর দেখতে যায়, বাগে পেলেই তারা মেয়ে চুরি করে। ষষ্ঠ শ্রেণীর গুণীদের দলে চোর, জোচ্চোর, পকেট-কাটা ও গুণ্ডাদের ধরতে পারি। তাদের মহিমায় অনেকের গলার হার, কাণের গহনা বা পকেটের টাকা অদৃশ্য হয়। জনতার মধ্যে এত রকমের গুণী থাকে, কিন্তু উৎসবের সমারোহের মধ্যে তাদের স্বরূপ চেনা শক্ত কথা। ফি বছরেই কত লোকের উৎসব-হাস্যই যে তারা বিষাদের ছায়ায় বিষণ্ণ ক'রে দেয়, তার আর হিসাব নেই।... ... ... বিসর্জ্জনের রাত্রে কলকাতার গঙ্গার তীর ও তার আশপাশের রাস্তা লোকে লোকে ভ'রে যায়, অমলিন নব-সাজসজ্জায় সে জনতা সকলেরই নয়নরঞ্জন করে। সেদিন নিশ্চিন্ত মিলনের দিন—শত্রুকেও মিত্র ব'লে আলিঙ্গন করবার দিন। প্রত্যেকের মুখে-চোখেই সে রাত্রে তাই একটি স্নিগ্ধ, শান্ত ও প্রীত ভাবের আভাস পাওয়া যায়—পথে পথে নমস্কার ও কোলাকুলির দৃশ্য। একটু বেশী রাতে পথে সেদিন মাতালের চেয়ে সিদ্ধিখোরের দলই চোখে পড়ে বেশী। অনেকেরই চোখ ছোট ছোট হয়ে যায়, মুখে অকারণ উচ্চ হাস্য ও তুচ্ছ প্রলাপ ফোটে এবং ভাবে-ভঙ্গিতে একটা অবসাদের ভাব জেগে ওঠে। অনেক নাবালকই সেদিন বন্ধুর বাড়ীতে সিদ্ধির মাত্রা বাড়িয়ে ফেলে, বাপ-মায়ের কাছে বকুনি খাবার ভয়ে বাড়ীতে ঢুকতে পারে না, তাই বেশী রাত্র পর্য্যন্ত তারা পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়।

দেওয়ালীর রাতে চিৎপুর রোডে—বিশেষ ক'রে চোরবাগানের মোড়

নজরে পড়ে। পথের ধারের দোকান-ঘরগুলি আলোকমালায় এবং সুলভ ও কু-শিল্পী অঙ্কিত চিত্রমালায় প্রাণপণে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-সব সাজসজ্জার মধ্যে লোভনীয় বিশেষত্ব তিলমাত্র না থাকলেও রাস্তার লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে তাইই দেখছে। প্রতিবারে প্রতি দোকানখানি ঠিক প্রায় একরকম ভাবেই সাজানো হয়, আমরা ছেলেবেলা থেকেই এটা লক্ষ্য ক'রে আসছি! এই একান্ত একঘেয়ে সজ্জা যেন বর্ত্তমানের বিচিত্র নূতনত্বকে প্রকাশ্যভাবে উপহাস করছে! হালুইকরের দোকানের খাবারগুলিও আজ থাকে থাকে বিশেষ কৌশলে সজ্জিত হয়েছে!

আলোক-মালার উপরেই বারান্দা, বিলাসিনীদের রূপ আজ দুষ্ট অন্ধকার গ্রাস করতে পারে নি, রং-বেরঙের ছোপানো কাপড় ও 'নিমা' প'রে, মুখে, গলায় ও হাতে পাউডার আর 'রুজ' মেখে, ভুরুকে কৃত্রিম উপায়ে যুগ্ম ভ্রূ'তে পরিণত ক'রে এবং চোখে 'সুর্ম্মা' টেনে ইহলোকের এই নরক-বাসিনীগুলি নিজেদের কদর্য্যতা যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে— যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোদার উপরে এই খোদকারী আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপেই ব্যর্থ হয়েছে! রাস্তার লোকগুলো শিবনেত্র হয়ে তাদের রূপসুধায় চোখের ক্ষুধা যথাসম্ভব মিটিয়ে নিচ্ছে,—কেউ নিতান্ত পচা রসিকতায় তাদের টিট্‌কিরি দিচ্ছে, কেউ নীচে থেকেই একটা অর্থপূর্ণ ইসারা ক'রে নিজেদের মুখ ঢাকবার জন্যে ঠোঁট থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাদর জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ছে, কোন কোন দুষ্ট ছোক্‌রা তাদের গায়ে জ্বলন্ত লাল বা নীল দেশলায়ের কাঠি ছুঁড়ে, কুৎসিত গালাগালি খেয়েও হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাচ্ছে—অনেকে বারান্দার উপরে ছুঁচোবাজি ছাড়্‌তেও ত্রুটি করছে না!... ...পথের উপরকার আকাশ আজ হরেক-রকমের বাজি ও ফানুষে বিচিত্র ও শব্দিত এবং বাতাসে বারুদের দুর্গন্ধ! মাঝে মাঝে এক-একটা হাউই বা 'রকেটে'র দগ্ধাবশেষ সবেগে নেমে এসে ঠক্ ক'রে পথিকদের কারুর মাথার উপরে প'ড়ে তাকে দস্তুরমত চম্‌কে দিচ্ছে, কেউ কেউ

বাজির পতন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সন্তর্পণে ছাতা মাথায় দিয়ে পথ চল্‌ছে !

কার্ত্তিক ও সরস্বতী পূজা কল্‌কাতার ঘরে ঘরে হয় এবং বিশেষ ক'রে এই দুই দেব-দেবী গণিকাদের অত্যন্ত প্রিয় দেবতা। কিন্তু এর কারণ বোঝা ভারি শক্ত। কার্ত্তিক হচ্ছেন দেব-সেনাপতি, চির-কুমার ও নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, তিনি কি ক'রে গণিকাদের প্রিয়পাত্র হ'লেন ? কার্ত্তিক পূজো ক'রে গণিকারা কি আমাদের এই কথাই বোঝাতে চায় যে,—"স্ত্রীরা আমাদের প্রধান শত্রু, অতএব তোমরাও চিরকুমার থাকো, আর একনিষ্ঠ হয়ে আমাদের উপাসনা কর ?" এ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্য হ'লেও আকাশ থেকে পড়ব না ! গণিকার কার্ত্তিক-প্রীতির তবু একটা মন-গড়া মানে পাওয়া গেল, কিন্তু মূর্ত্তিমতী বিদ্যার পূজা 'অবিদ্যা' নামে খ্যাত জীবগুলির আলয়ে কেন যে হয়, এ সমস্যা একেবারেই দুর্ব্বোধ !

এই দুই পূজার রাত্রে গণিকারা বাবুদের প্রণামীর দৌলতে রীতিমত লাভবান হয়, কারণ তারা অধিকাংশ উপপতি ও বন্ধুকেই সাদরে আমন্ত্রণ করে। বাবুদের মধ্যে প্রণামী নিয়ে বেশ টকরাটক্করিও লেগে যায়, ইনি পাঁচটাকা দিলে উনি দেন দশটাকা এবং তাই দেখে আর-এক মহাত্মা হয়তো বিশটাকা ছেড়ে বসেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব যতই বেড়ে ওঠে, গণিকাদের ততই মজা ! ভদ্রবাড়ীর মত এখানকার পূজাতেও অতিথিদের আদর-যত্ন ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় পাণ থেকে চূণটি পর্য্যন্ত খসে না ! নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা কিছু নিষ্ঠাবান, তারা সাজানো সভায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ব'সে, রূপো-বাঁধানো হুঁকোয় বা গড়্‌গড়ার নলে দু-চারটে টান মেরে ও দু-একটা পাণ খেয়েই কোন ওজর দেখিয়ে স'রে পড়ে—গণিকালয়ে পাত না পেতেই। কিন্তু তবু আহার-স্থানে ভদ্রসন্তানেরও অভাব হয় না এবং তারাই দলে

চলে এবং সম্ভ্রান্ত গণিকারা নাচ-গান-আমোদের ব্যবস্থাও করে প্রচুর—অতিথিদের প্রীত্যর্থে। মদের বোতল সেদিন খালি হয় পলকে পলকে! অনেক সময়ে একই বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে খুড়ো-ভাইপো প্রভৃতিও পরস্পরের কাছে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে যান! (বলা বাহুল্য, সুচতুর গণিকারা পূজোর সমস্ত খরচ পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে সব-চেয়ে নির্ব্বোধের মাথাতেই হাত বুলিয়ে আদায় ক'রে নেয়। মাঝে এক সুবর্ণ-বণিক জাতীয় ছোক্‌রা বাবু কাপ্তেন-সমাজে এই ব্যাপারে যার-পর-নাই নাম কিনেছিল। সে ছোক্‌রা ছুদিন উড়তে ও বাপের পয়সা ওড়াতে শিখেই, সরস্বতী পূজোয় পাঁচশো না সাতশো টাকায় এক জম্‌কালো প্রতিমা গড়ায় এবং পূজোর রাত্রে প্রতিমার মূল্যের অনুপাতে অন্যান্য খরচও করে অসম্ভব রকমের। তার কিছু দিন পরেই যখন শুন্‌লুম যে, ছোক্‌রা 'ইনসল্‌ভেন্সি' নিয়েছে, তখন কিছুমাত্র অবাক হলুম না। কারণ, এই কাপ্তেন-বাবুদের মনস্তত্ত্ব অতি অদ্ভুত। পুড়ে মর্‌বে জেনেও তারা যেচেই আগুনের দিকে এগিয়ে যায়, যেন পুড়ে মরাতেই তাদের আনন্দ! আকণ্ঠ ঋণে ডুবে গেলেও তারা আরো বেশী ডুবে যাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সাঁতার জানলেও সাঁতার কাটবে না। এও একরকম পাগলামি বা আত্মহত্যা আর কি।)

ফুলদোলের রাত্রে নিমতলা ষ্ট্রীটে অপূর্ব্ব এক দৃশ্য দেখা যায়। এ পথে পাশাপাশি নানা দেব-দেবীর সংখ্যা অনেক। প্রায় প্রত্যেক দেবালয়ের সুমুখেই প্রকাশ্য রাজপথের উপরে ছোট-বড় চাঁদোয়া খাটানো হয়, সতরঞ্চ ও চাদর পাতা হয়। এক এক দল লোক এক এক জায়গায় ব'সে গান-বাজনা সুরু করে। কোথাও একদল বাউল-বেশী লোক নাচ্‌তে নাচ্‌তে গান গায়, কোথাও বৈঠকী গান হয়, কোথাও নানান রকম বাদ্যযন্ত্র বাজতে শোনা যায়। নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দিরে যে বৈঠকী গানের আসর

শ্রোতারা প্রায়ই অনাহুত বা রবাহুত। কিন্তু পাণ প্রভৃতি দিয়ে তাঁদেরও সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। সে রাত্রে ঐ রাস্তায় অনেক গণিকা ও আধা-ভদ্র শ্রেণীর যুবতীকে দেখা যায়। রসিক শ্রোতারা কাণ পেতে গান শোনেন, চোখ রেখে এদের উপরে। যথাসময়ে রসিকরা অবশ্য তাদের পিছনে পিছনে যেতেও ভুলে যান না!

কল্‌কাতার পাড়ায় পাড়ায় অসাময়িক উৎসবের আসর বসে বারোয়ারি-তলায়। এ ব্যাপারেও বৎসর কয়েক আগে পাথুরেঘাটাই সর্ব্বাগ্রে গণনীয় ছিল। পাথুরেঘাটার বিন্ধ্যবাসিনীর মত প্রকাণ্ড প্রতিমা আর কোন বারোয়ারিতে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। এ প্রতিমাকে বিসর্জ্জনের দিনে কেউ কাঁধে করতে পারত না, একখানা মস্ত লম্বা চওড়া গাড়ীতে বসিয়ে শত শত লোক মিলে টেনে নিয়ে যেত। গাড়ীসুদ্ধ প্রতিমার উচ্চতা ছিল আড়াই-তলার কম নয়—সে এক বিরাট ব্যাপার। সেই সঙ্গে আগে সঙেরও আয়োজন ছিল। তিন দিন পূজা হ'ত এবং প্রতি রাত্রে ও দিনে শ্রেষ্ঠ যাত্রা ও পান্নার কীর্ত্তন প্রভৃতি উপভোগের জন্যে বারোয়ারি তলা বিপুল জনতার সমাগমে গম্ গম্ করতে থাক্‌ত। বিন্ধ্যবাসিনী পূজার পরেই উল্লেখযোগ্য লোহাপটি ও জোড়াবাগানের বারোয়ারি। এ দুই জায়গাতেই দেবী হচ্ছেন রক্ষাকালী। লোহাপটির বারোয়ারি সঙও কল্‌কাতায় খুব প্রসিদ্ধ। সেখানে এখনো বারোয়ারির সময়ে দিনে ও সারা রাত ধ'রে যাত্রা প্রভৃতি নানা আনন্দের ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ বারোয়ারি উৎসবে সমাগত নারী-শ্রোতাদের মধ্যে নিম্ন-শ্রেণীর গণিকার সংখ্যা বেশী।

কল্‌কাতায় রাত্রিকালে আরো নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া অসম্ভব।

অষ্টম দৃশ্য

অন্ধকূপের বাসিন্দা

শীতের রাত !... ...

ভারি অরসিক এই শীত, বাবুদের সখের খাতির সে রাখে না ! দখিন হাওয়ার গলা টিপে, ইল্‌সে-গুঁড়ির বাজার মাটি ক'রে, শনিবারের আমোদে বাজ হেনে বুড়ো শীত সহরের ভিতরে জাঁকিয়ে ব'সে থাকে—নেটিভদের অভিশাপের কুছপরোয়া না রেখে ! অমন যে রূপ দীপালির পাড়া সোনা-গাছি, রাত ন'টা না বাজ্‌তে বাজ্‌তেই কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছে ! দুপুর রাতে সেখানে আর জনমানবেরও টিকি দেখ্‌বার যো নেই, কবেকার এক সোনা গাজীর কবরের প্রাচীন স্মৃতি নিয়ে সোনাগাছি এখন কুয়াসায় ঝাপ্‌সা ও নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে ঠিক গোরস্থানের মতই দেখাচ্ছে ! সখের বাবুরা ঘরের সমস্ত ছ্যাঁদা সন্তর্পণে বন্ধ ক'রে লেপের ভিতরে ঢুকে ঠাণ্ডা হাওয়াকে 'বয়কট' ক'রেছেন, রূপসীরাও শূন্য ঘরে একেশ্বরী হয়ে ব'সে ব'সে শীতের মুখে নুড়ো জ্বাল্‌বার ব্যবস্থা দিচ্ছে—বাবুর বাজার ভারি আক্রা ! ঘরে ঘরে গলাধাক্কা খেয়ে শীত হু হু ক'রে কন্‌কনে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে কল্‌কাতার পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং মনের যত ঝাল গরীবদের উপরেই ঝেড়ে নিচ্ছে !

কুয়াশা আর কুয়াশা আর কুয়াশা ! যেদিকে চাই খালি কুয়াশা আর ধোঁয়া ! কল্‌কাতার দীপ্ত রূপ একেবারে ময়লা হয়ে গেছে। গ্যাসের আলো পর্য্যন্ত কুয়াশা আর ধোঁয়া মেখে দুঃখীর ম্লান ছলছুলে চোখের মত সকাতরে চেয়ে আছে। দু-পাশের সমস্ত বাড়ীর প্রত্যেক জান্‌লা দরজা

বাতাস জেগে উঠছে—সে আস্‌ছে কোন্ তুষারের মরুভূমি থেকে এবং যে অভাগার পথের কাজ সারা হয় নি, বায়বীয় বরফের মত সেই ভীষণ ঝোড়ো ঝাপটায় তার দেহের প্রত্যেক ধমনীতে রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে! আকাশে চাঁদের আবছায়া জেগে আছে বটে, কিন্তু তার মুখ যেন মর-মর রোগীর মত শীর্ণ ও পাণ্ডু!

হে সুখশয্যায় শায়িত বিলাসী! তোমার তপ্ত নৈশ প্রচ্ছাদনীর অন্তরাল থেকে একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্যে বাইরে বেরিয়ে এস! তোমার সুখ-স্বপ্নের অবকাশে ক্ষণেকের জন্যে বাস্তবের কঠিন মূর্ত্তি দেখে যাও! এতে আনন্দ নেই, কিন্তু নিয়তির নির্দ্দয় উপহাসে সত্য যে কি ব্যথার জনক হয়, অন্তত তারও কিছু কিছু পরিচয় পাবে!... ... ...

দেখ, এক বুড়ো চলেছে বুড়ীর হাত ধ'রে—সাম্‌নের দিকে হুম্‌ড়ে ভেঙে প'ড়ে! এ বুড়ো অন্ধ—বুড়ীর দুটো স্তিমিত চোখের সাহায্যেই সে তার কাজ চালাচ্ছে! তার গায়ে কাপড় নেই, কোমরের সম্বল এক কপ্‌নি, তাও ছেঁড়াখোড়া! জুতো, মোজা, সোয়েটার, গলাবন্ধ, ওয়েষ্ট-কোট, কোট, ওভার-কোট, অলষ্টার, শাল-দোশালা আর যৌবনের প্রবল উত্তাপেও তোমার শীত ভাঙ্‌ছে না—কিন্তু এ বুড়ো আর বুড়ী তবু কি-ক'রে এমন কঠোর শীতেও বেঁচে আছে? ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে, দাঁতে দাঁত লাগাতে লাগাতে বুড়ো করুণ মিনতি-ভরা আর্ত্ত রবে সমান ডেকে চলেছে—"একটা পয়সা ভিক্ষে দাও—বাবুগো, একটা পয়সা ভিক্ষে দাও!"—তুমি শালদোশালার পোষ্যপুত্র, পাশ দিয়ে একে ধাক্কা মেরে চ'লে যাচ্ছ—পকেট তোমার রূপোর টাকায় ভরতি—কিন্তু তার এক কণাও বুড়ো-বুড়ী পাবে না! কিন্তু তবু তারা সমান কেঁদে চলেছে, সারাজীবন হতাশার সঙ্গে যুঝে-যুঝেও তবু তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, সারাজীবন কেঁদে-কেঁদেও তাদের

যে সংসারের বাতিল মাল! তারা ডাকবে তাদের, যৌবন যাদের সহায়, পৃথিবী যাদের উৎসব-গৃহ, দুনিয়া যাদের ভালোবাসে!

আরো দু পা এগিয়ে এস। পথের ধারে ধারে,—অনাবৃত ফুটপাথের উপরে চেয়ে দেখ, সারি সারি নর-মূর্ত্তি পাশাপাশি শুয়ে আছে— চারিদিকে শীত আর কুয়াশা আর ঠাণ্ডা হাওয়া নিয়ে। এদের ঘর নেই—পথের উপরেই এদের জন্ম ও মৃত্যু! মাঝে মাঝে শীতের বর্ষা নামে, তখন এদের উপভোগের পাত্র সত্য সত্যই কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে! রাজপথে কুকুর আছে, বিড়াল আছে,—কিন্তু এরা মানুষ! তোমার আমার মতই মানুষ! তোমার আমার মতই রাজধানীর বাসিন্দা! তোমার আমার মতই এক রাজার প্রজা, এক ভগবানের সন্তান, এক সুখ-দুঃখের অধীন! তবু তোমার আমার সঙ্গে এদের কি প্রভেদ! মনুষ্যত্বের এই কল্পনাতীত দুর্ভাগ্য, এ হচ্ছে রাজধানী কল্‌কাতারই নিজস্ব। এমন দৃশ্য পল্লীগ্রামে দুর্লভ।

এগিয়ে চল—এগিয়ে চল! চোখের সাম্‌নে দৃশ্যের পর দৃশ্য বদ্‌লে যাচ্ছে। ঐ দেখ, পথের ধারের খাবারের দোকানগুলো সাজানো রয়েছে। তাদের প্রকাণ্ড উনুন, তলায় মস্ত-বড় গর্ত্ত—ছাইভস্ম যেখানে সঞ্চিত হয়। সেই-সব গর্ত্তের ভিতরে মাঝে মাঝে দেখবে, শীতার্ত্ত হতভাগ্যেরা দুই পা ঢুকিয়ে দিয়ে পথের উপরে মরণাহতের মত ঘুমিয়ে অসাড় হয়ে আছে! সে আগুনের আঁচ তুমি-আমি সইতে পারব না,—তাদের কিন্তু সে অনুভূতি নেই! হয়তো শীতে কেঁপে-মরার চেয়ে চাম্‌ড়া-ঝল্‌সানো তাপ তাদের কাছে বেশী কাম্য!

এক একটা নোংরা, অন্ধকার গলির মোড়ে বা ধারে নিম্ন স্তরের গণিকারা অনেক রাত পর্য্যন্ত পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এই দেহের ব্যবসা যে কতটা কামগন্ধহীন, শীতের রাত্রে তার অকাট্য

প্রচণ্ড, হিম যখন মর্ম্মান্তিক, নেড়ে-কুকুরগুলোও যখন অদৃশ্য, পথের উপরে তখনো তারা সমান দাঁড়িয়ে আছে—লোক আসবার সম্ভাবনা নেই, তবু আশার বিরুদ্ধে আশা ক'রেও দাঁড়িয়ে আছে—ধোঁয়া-কুয়াশায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে—শীতে সর্ব্বাঙ্গ কালিয়ে গেছে, দেহ আর বশ মানছে না, তবু দাঁড়িয়ে আছে! চার আনা, ছআনা, আটআনা পয়সা—তাও রোজ তাদের জোটে না। মাঝে মাঝে পুলিসের লোক আসছে, আর তারা প্রাণপণে ছুটে আপনাদের অন্ধকূপের মত বাসা বা গহ্বরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ছে, যারা পালাতে পারছে না তাদের উপরে বেত, চড়, ঘুসি বা লাথি বৃষ্টি হচ্ছে!... ...খানিক পরেই আবার দেখবে, তারা স্বস্থানে এসে অবস্থান করছে! কিছুকাল আগে একদিন দেখেছিলুম, জোড়াবাগানের পুলিসের আস্তানার এক সাহেব, পথের ধারে এই শ্রেণীর এক অভাগীর পিছনে তাড়া করল। খানিক দূর গিয়েই সাহেব তার আঁচল চেপে ধরলে—কিন্তু ভীত স্ত্রীলোকটি কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রেই একটানে পরোণের কাপড় ফেলে দিয়ে, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পথ দিয়ে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল! সাহেবের চোখে সে দৃশ্য নূতন, স্তম্ভিতের মত পথের উপরে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!... ...অনেক স্ত্রীলোক পাহারাওয়ালা দেখেও পালায় না, পাহারাওয়ালারাই বরং তাদের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় ইয়ার্কি দেয়। কারণ আর কিছু নয়—এ সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক নয়—পাহারাওয়ালার ট্যাঁক খুঁজে দেখ, এই হতভাগিনীদের কষ্টার্জ্জিত দু-এক খণ্ড তাম্র সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে! এদের দেখলে সত্যই আমার চোখ ভিজে আসে—গণিকা হ'লেও এরা তো প্রাণহীন নয়! শুনেছি বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ দিয়ে যেতে যেতে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দেখ্‌লে, প্রত্যেকের হাতেই কিছু কিছু অর্থ গুঁজে দিতেন! এদের দুঃখে তাঁর দয়ার প্রাণ সাড়া না দিয়ে পারত না। উচ্চস্তরের গণিকারা বারান্দায় কপের দোকান সাজিয়ে

নাকি বেআইনী। বারান্দায় গণিকা দাঁড়ানো বেআইনী নয় কেন? রাজদণ্ড কি গরিবদের জন্যেই ?)

মোড়ে মোড়ে পাণের দোকান—সে-সব দোকানে পাণওয়ালীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছে, পাণ বেচবার অছিলায় তাদের রূপের ব্যবসাও বেশ ভালোরকমেই চ'লে যায়। এই-সব দোকান পাহারাওয়ালাদের বিখ্যাত আড্ডা। শীত বেশী বাড়লে ও প্রাণটা বেশী ঠাণ্ডা হ'লে পাহারাওয়ালাজী গোঁফ দাড়ীতে মোচড় দিতে দিতে, ঠোঁটে রসের হাসি মাখিয়ে পায়ে পায়ে পাণের দোকানের দিকে অগ্রসর হন—স্যাঁতা প্রাণকে কথঞ্চিৎ তাতিয়ে নেবার জন্যে! পানওয়ালীও মিষ্টি হাসি হেসে তখনি পাহারাওয়ালাজীকে ভালো ক'রে সেজে একটি বা দুটি পানের খিলি ও গোলাপী বিঁড়ি উপহার দেয়। তার পর দুজনের মধ্যে মৃদুস্বরে রসালাপ চলে। এমন রসালাপের মধ্যেও পাহারাওয়ালাজী কিন্তু আত্মহারা হয়ে পড়েন না, দৃষ্টি তাঁর বিলক্ষণ সজাগ থাকে—চোর ধরবার জন্যে নয়, অতর্কিতে পাছে কোন উপরওয়ালা এসে পড়েন, সেই ভয়ে! মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস, কল্‌কাতার রাস্তায় পাহারাওয়ালার কাছে পাণওয়ালীরাও তেম্‌নি—বড় দুঃখে একটুখানি সুখের ফোঁটা!

শীতের রাত্রে কোন কোন রাস্তার মোড়ে গরিব বেহারীরা প্রকাণ্ড আগুন জ্বেলে চারপাশে তার গোল হয়ে বসে। সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রে একটু বিশ্রামের অবকাশ মিলেছে, এ সময়টা তারা শীতে কেঁপে মরতে চায় না। আগুন পোয়াতে পোয়াতে তারা সমস্বরে গান ধরে,—সেইসঙ্গে ঢোল ও করতাল চলে, গান ও বাজ্‌না ক্রমে দূন হয়ে ওঠে—ক্রমে তা একটা দুর্ব্বোধ হট্টগোলে পরিণত হয়, সে থচ্‌মচ্‌, দুম্‌দাম্‌, হৈ-চৈ শুনে আশপাশের পাড়া থেকে ঘুম একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ধনীরা চ'টে লাল হয়ে ওঠেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত—যতক্ষণ না গলা ও হাত শ্রান্ত হয়ে

আছে, আমরা তা বুঝব না। গরিবের উপভোগ গরিবেই বোঝে।... ...

ভিখিরী-পাড়ায় কখনো গিয়েছেন? কল্‌কাতার স্থানে স্থানে ভিখিরী-পাড়া আছে, আমরা অনেকেই তার অস্তিত্বের কথা জানি না। এখানে তারাই আড্ডা বানিয়ে থাকে, পরের টাকায় যাদের দিন চলে। এইখানেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের প্রভেদ এবং এই পার্থক্যের জন্যেই আর পাঁচ-জনের সঙ্গে তাদের চরিত্র মিশ খায় না। আমরা অনেকে সমাজের ভিতরে জেনে-শুনেও চোর-জোচ্চোর বা অসাধুর সঙ্গে প্রকাশ্য সম্বন্ধ রেখে থাকি, কিন্তু ভিখিরীর সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখতে আমরা সকলেই নারাজ—যদিও অনেক ভদ্রবেশী ভিখিরী আমাদের মধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করে। প্রকাশ্যে যারা ভিক্ষাকে ব্যবসা করে, সাধারণ সমাজের মধ্যে থাকৃতে না পেলেও, তাদের এক নিজস্ব সামাজিক জীবন আছে—সে জীবনের সঙ্গে মনু-সংহিতার বিধি-নিষেধ কিছুই মেলে না! এই ভিখিরী-পাড়ায় আমি মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে এসেছি। তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে এক নূতন সুর জুড়ে দিতে পারে—কিন্তু রুসিয়ার মত এদেশেও কোন বাঙালী ম্যাক্সিম গোর্কি জন্মান নি, তাই এই সমাজ-বহির্ভূত সমাজের বিচিত্র ফোটো সাহিত্যের আসরে দেখ্‌তে পাই না!

ভিখিরী-পাড়ায় দিনের বেলায় বড়-কিছু দেখবার থাকে না—কারণ বাসিন্দারা তখন কল্‌কাতার নানা দিকে দৈনিক ব্যবসা করতে যায়! প্রথম রাতেও অনেকে ফেরে না,—জাল অন্ধ ও খোঁড়া প্রভৃতি সে দলে থাকে। চোখ থাকতে যারা কাণা, দিনের বেলায় তাদের ব্যবসার সুবিধা হয় না—কারণ দাতারাও তো চোখ থাকৃতে কাণা নয়! সন্ধ্যার মুখে ভিখিরী-পাড়ার মজ্‌লিস একটি দেখবার দৃশ্য। সাধারণত সহরের খুব ওঁচা অংশে ভিখিরীরা বাস করে। সরু গলি,—ভিতরে আলো আর হাওয়ার যথেষ্ট অভাব, চারিদিকে নোংরা আবর্জ্জনা ছড়ানো, তারই মধ্যে

ভিখিরীদের বাস। তাদের অনেকেই বংশানুক্রমে ভিখিরী, চোদ্দ-পুরুষেরই এক ব্যবসা! খুব গরিবের ছেলেও কালে রাজা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কিন্তু ভিক্ষাপুষ্ট রক্তে যার জন্ম, সে বোধ হয় কখনো আর কর্ম্মী হয়ে নাম কিন্‌তে পারে না—ভিখিরীর ছেলে তাই ভিখিরীই হয়—অকর্ম্মণ্য, পরান্নভোজী আলস্য-ব্যাধি এম্‌নি বংশানুক্রমিক! আর আলস্যই বা বলি কেন, ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্যে তাদের অধিকাংশকেই যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, তার তুলনায় চাকুরির পরিশ্রম ঢের-বেশী সহজ। কিন্তু তবু তারা তা করতে পারে না, কারণ ভিক্ষার মোহ তাদের মজ্জাগত! এ যেন কোকেন বা আফিমের নেশা, অভ্যস্ত হ'লে আর উপায় নেই!

ভিখিরীরা অনেকেই সপরিবারে বাস করে! তাদের মা, বোন, বৌ, মেয়ে ও ছেলে—সবাই ভিখিরী! ধর্ম্মে তারা হিন্দু হ'লেও তাদের মধ্যে জাতিভেদের বড় বেশী কড়াক্কড়ি নেই। আমি এমন কোন কোন ভিখিরীকে দেখেছি, যারা সর্ব্ব নিম্ন-স্তরের গণিকা বা গণিকার মেয়েকে বিবাহ করেছে! এখানে চরিত্রের দাম খুব কম বা কিছুই নেই। ভিখিরীর মেয়ে বা স্ত্রী প্রায়ই প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করলেও কেউ কিছু বলবে না। সামাজিক কোন বন্ধনেরই ধার এরা ধারে না—যেন-তেন-প্রকারেণ দেহের সঙ্গে আত্মাকে একত্রে রাখাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

গলির মধ্যে এক-একটা গর্ত্তের মত ঘরে অল্পবয়সী ভিখিরীদের আড্ডা বেশ জ'মে ওঠে। আমার বাড়ীতে আগে এক যুবক ভিখিরী আস্‌ত, তাকে ডাক্‌ত সবাই 'পাগ্‌লা' ব'লে। গান গেয়ে তার দৈনিক রোজগার বড় মন্দ হ'ত না। এই পাগ্‌লার সঙ্গে ভাব ক'রে বার দুই-তিন আমি ভিখিরীদের আড্ডায় গিয়ে বসেছি। আড্ডার মধ্যে প্রথম দিনে আমার আবির্ভাব সকলেরই মুখ বোবা ক'রে দিলে। অত্যন্ত সন্দেহ ও বিস্ময়ের সঙ্গে বার বার তারা আমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে লাগল। কেউ

পুলিসের লোক ভেবে। পুলিসকে এরা ভারি ভয় করে—কারণ ভিক্ষা করতে গিয়ে সুবিধা পেলে এরা অনেকে গৃহস্থের ঘটি-বাটি সরাতেও ইতস্তত করে না কিনা!

কিন্তু পাগ্‌লা তাদের অভয় দিয়ে বল্‌লে, "ভয় নেই ভাই, ভয় নেই! ইনি আমার চেনা বাবু, আমাদের আড্ডা দেখ্‌তে এসেচেন! তোমরা ফূর্ত্তি কর, যাবার সময়ে বাবু তোমাদের খুসি ক'রে দিয়ে যাবেন!"

আমার খেয়াল দেখে তাদের বিস্ময় কম্‌ল না বটে, তবে সকলের ভাব দেখে বোঝা গেল, তারা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল।

ঘরের চারিদিকে মাটি-ল্যাপা, এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল—পথের দিকের দেওয়ালের নীচের দিকটায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লেগে, ভিতরকার কঙ্কাল —অর্থাৎ বাঁথারিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। দেওয়ালের উপর-দিক্ 'আল্‌ম্যানাকে'র ও সস্তা-দরের সিগারেটের অসংখ্য ছবি দিয়ে অলঙ্কৃত! একদিকে একখানা শতছিন্ন মাদুর-বিছানো চৌকি আর গোটা-দুই ওয়াড়-হীন তৈল-পক্ক ময়লা বালিস,—এত কালো যে, হঠাৎ দেখ্‌লে 'অয়েল-ক্লথে' তৈরি বলে মনে হয়। আর-একদিকে মেটে মেঝের উপরে দুখানা দর্ম্মা বিছানো। এককোণে একটা তোলা উনুন, ও কতকগুলো হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি! বুঝলুম, এই একটা ঘরই সময়-বিশেষে বৈঠকখানা, রান্নাঘর ও শয়নাগারে পরিণত হয়।

ঘরের লোকগুলো সব কেউ চৌকির ও কেউ মেঝের উপরে শুয়ে বা ব'সে জটলা করছিল। তাদের প্রত্যেকেরই চেহারা ঝোড়ো কাকের মত! কেউ কেউ যে কত দিন অস্নাত আছে, তার হিসাব জানেন একমাত্র ভগবান্! সকলেরই পরোণের কাপড় ময়লা, ছেঁড়া বা তালি-মারা! ঘরের ভিতরে এমন একটা মিশ্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল যে, ক্ষণকালের মধ্যেই নাসিকা অস্থির হয়ে উঠল। তার উপরে আবার গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ। প্রায়

রোগা লোক, এককোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, একটা লম্বা মুখনলওয়ালা ছোট হুঁকা নিয়ে ব'সে আছে। খানিক পরেই দেখলুম, সে লোকটা নলে টান মারলে ও ফুড়ুক্ ক'রে একটা আগুনের ছিটে তার কল্কে থেকে ঠিক্‌রে পড়ল। সে গুলিখোর। আর একটা রোগা লোক ট্যাঁক থেকে একটা মোড়ক্ বার ক'রে, মোড়কটা খুলে হু'হাতে মুখের সাম্‌নে ধরলে ও জিভ দিয়ে খানিকটা সাদা গুঁড়ো সাবধানে চেটে নিলে। সে কোকেনখোর! .... একটু পরে একটা স্ত্রীলোক এসে ঘরে ঢুক্‌ল। বয়স বোধ হয় তার চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না, কিন্তু চেহারা এম্‌নি পাকিয়ে গেছে যে, তাকে প্রৌঢ়া বল্‌লেও চলে। দেহের রং কুচ্‌কুচে কালো, পরোণের কাপড়খানাও যেন দেহের রঙেই ছুপিয়ে নেওয়া হয়েছে! ঘরের ভিতরে এতগুলো পুরুষ, আর সে যে স্ত্রীলোক, এজন্যে তার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই —কারণ তার বুকের উপরে স্ত্রী-চিহ্ন দুটো সম্পূর্ণ বেপরোয়ারই মত অনাবৃত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ ক'রে আছে!

ঘরের ভিতরের একজন তাকে দেখে বল্‌লে, "কি গো পটলির মা, এখানে কি মনে ক'রে?"

পটলির মা বল্‌লে, "হ্যাঁরে বিশে, তোর কাছে ভাই পুরিয়া টুরিয়া কিছু আছে?"

বিশে বল্‌লে, "হুঁ, গোটা দুই আছে। কি দরকার তোর?"

—"মাইরি! আমার রসদ কম্‌লে আমি খাব কি?"

পটলির মা বল্‌লে, "দে না ভাই আমায় একটা!"

—"তোর পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি! আমি দাম দিচ্চি। না দিলে আমি ম'রে যাব, তাই কি তুই চাস্?"

—"কেন, পুরিয়া ফুরিয়েচে তো আল্‌গুর আড্ডায় যা না!"

বিশে চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, "অ্যাঁ, আড্ডা বন্ধ! তাহ'লে তোকে পুরিয়া দিলে আমাকে দেখ্‌বে কে?"

—"দিবি না তাহ'লে, কেমন?"

বিশে প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে—না!

—"আচ্ছা রে মড়িপোড়া মিন্সে, মনে রইল! এবার তোর পুরিয়া কম পড়লে যেদিন আমার পায়ে ধরতে যাবি, সেদিন থ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব!" পট্‌লির মা আরো কি-সব বল্‌তে যাচ্ছিল, হঠাৎ পাগ্‌লা তাকে সাবধান ক'রে দিলে—"চুপ কর্‌ পট্‌লির মা! দেখ্‌চিস্‌ না, ঘরের ভেতরে বাবু রয়েচে!"

এতক্ষণে পট্‌লির মায়ের চোখ আমার উপরে পড়ল। এক মুহূর্ত্ত হতভম্বের মত আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে, তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। তাহ'লে তার লজ্জা আছে!

আমি বল্‌লুম, "হ্যাঁরে পাগ্‌লা, পট্‌লির মা কি চাইছিল?"

—"ওর কোকেন ফুরিয়ে গেছে বাবু, তাই হন্যে হ'য়ে এখানে ছুটে এসেচে।... ...আর, তুইও তো আচ্ছা মানুষ, বিশে! দেখ্‌চিস্‌ পট্‌লির মা কষ্ট পাচ্চে, ওকে একটা পুরিয়া দিলে কি হ'ত?"

—"কি কথাই বল্‌লি ইয়ার! তার পর আমি কার পায়ে মাথা খুঁড়তুম? শুন্‌লি তো, আল্‌গুর আড্ডা বন্ধ!"

—"তবু একটা পুরিয়া দেওয়া উচিত ছিল!"

বিশে এবার রেগে বললে, "দিইনি, আমার খুসি! এই যে তোরা সেদিন একটা পাঁট কিন্‌লি, আমাকে এককোঁটা দিয়েছিলি কি? নিজের পানে তাকিয়ে কথা ক!"

পাগ্‌লা একবার আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে, অপ্রতিভের

কল্‌কাতার ভিথিরীদের আংশিক চিত্র এই রকম। এই হচ্ছে দীন ভিখিরীর দল, যাদের কাতর মুখ, করুণ চাহনি আর আর্ত্ত স্বর আমাদের প্রাণ-মন গলিয়ে দেয়। আমরা এদেরই ভিক্ষা দি! কিন্তু সে পয়সা যায় নেশার পূজায়। খালি রাজেন মল্লিকের বাড়ীতে নয়, কল্‌কাতার আরো কোন কোন ধনীর বাড়ীতে দৈনিক ভিখারী-খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। অনেকে সেইখানেই খেয়ে নেয়, আর আমাদের দানের পয়সা মদ, গাঁজা, চরস, গুলি বা কোকেন কিনবার জন্যে তুলে রাখে—অর্থাৎ আমরাই তাদের নেশার খরচ যোগাই! এইভাবে অধঃপতনের অন্ধকূপের নিম্নতম স্তরে ব'সে এরা পশু-জীবনের দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়!

... ...

... ...

কল্‌কাতার অন্ধকূপের আরো অনেক বৈচিত্র আছে। "অন্ধকূপ" বলতে আমি বোঝাতে চাই সেই-সব স্থান, ইংরেজীতে যাকে বলে "আণ্ডার-ওয়ার্ল্‌ড্‌"। এখানকার বাসিন্দা হচ্ছে চোর, ডাকাত, খুনে ও নিম্নশ্রেণী গরিবের দল প্রভৃতি। নিম্নশ্রেণী বা 'ছোটলোক'দের মধ্যে দারিদ্র্য বরাবরই পাপের অগ্রদূত।

একদিন রাত তিনটের সময়ে আমি ঘুরতে ঘুরতে জোড়াবাগান অঞ্চল দিয়ে ফিরছি। সঙ্গে একজন বন্ধুও ছিলেন।

হঠাৎ পথের পাশে এক জায়গায় অনেক লোকের গলা ও নাচ-গান বাজ্‌নার আওয়াজ পেলুম। পাশেই একটা গলি। সেখানে একপাশে খানিকটা খোলা জমি—তার উপরে সামিয়ানা খাটানো। একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখি, চাঁদোয়ার তলায় মস্ত আসর বসেছে! বাইজী গান ধরেছে, আর প্রায় দেড়শো লোক ব'সে ব'সে তাই শুনছে। শ্রোতারা প্রায় সকলেই পশ্চিমের লোক এবং তাদের মধ্যে অনেকেই গরুর-গাড়ীর

গুণ্ডামি। গরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানদের অনেকেই যে কি ভীষণ চরিত্রের লোক, কল্‌কাতার অধিকাংশ বাসিন্দাই তা জানেন না। আমি চোখের উপরে দেখেছি, এরা পথিকদের মেরে-ধ'রে টাকাকড়ি কেড়ে নিচ্ছে! কল্‌কাতার অনেক বিখ্যাত গুণ্ডা গরুর-গাড়ীর আস্তানার মালিক বা গাড়োয়ান। এই বছর-খানেক আগেই নিমতলা ঘাটের কাছে এই শ্রেণীর গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিনের বেলায়, জোড়াবাগান পুলিস-কোর্টের ঠিক পাশেই, একটি দেশী মদের দোকানের উপরে চড়াও হয়ে বিনামূল্যে মদ খেতে চায়। দোকানের মালিকরা রাজি না হওয়াতে তারা একজনকে খুন ও দুজনকে সাংঘাতিক রকম জখম ক'রে যায়। কিন্তু ইংরেজী আইন এমন প্যাঁচালো যে, তারা ধরা পড়লেও শাস্তিলাভ করলে না।

এমন সব ঠ্যাঙাড়ে ও খুনেদের প্রাণেও সখ আছে! তারা আজ কেমন ভালো-মানুষ সেজে বাইজীর গান শুনছে! আমারও হঠাৎ সাধ হোলো, বিনা-নিমন্ত্রণেই তাদের আসরে গিয়ে ব'সে খানিকক্ষণ সকলের হালচাল পর্য্যবেক্ষণ করতে! বন্ধুকে মনের কথা খুলে বল্‌লুম, তিনি তো ভয়ানক নারাজ! বল্‌লেন, "বল কি হে! যেচে হাঁড়িকাঠে মাথা গলানো! এ হতেই পারে না!"

বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় বলে গেছেন—এক একটা ছেলেকে জুজুর ভয় দেখালে ভয় পায় না, উল্টে জুজুকে দেখ্‌তে চায়! ছেলেবেলা থেকেই আমারও স্বভাব অনেকটা এইরকম। এজন্যে কতবার কত বিপদে পড়েছি বটে, কিন্তু সে-সব বিপদ থেকে আমি এমন-সব নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ও নর চরিত্রের এত রকম অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখবার সুযোগ পেয়েছি, সাধারণ বাঙালী-জীবনে যা দুর্লভ! আমি জীবন দেখতে চাই, জীবন! বিছানায় শুয়ে বা কেতাব প'ড়ে তা দেখা যায় না!

বন্ধুকে প্রবোধ দিয়ে বললুম, "মাভৈঃ! দুর্গা ব'লে ঢুকে তো পড়ি

আমি গুণ্ডাদের জানি। বাইরে থেকে তাদের দেখতে যতটা ভয়ানক, আসলে তাদের ভিতরকার চেহারাও ঠিক ততটা নয়। দরকার হ'লে তারা খুব সহজেই এক ফুঁয়ে মানুষের জীবন-দীপ নিবিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সে হচ্ছে তাদের ব্যবসা এবং সে নির্ম্মমতা সাময়িক। সাধারণ জীবনে তারা তোমার-আমার মতই মানুষ। তখন তোমার-আমার মতই তারা ভালোবাসে, স্নেহ করে, আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে মেতে থাকে। দয়া-ধর্ম্মেও তারা বঞ্চিত নয়! মহাদেও ব'লে এক প্রচণ্ড গুণ্ডাকে জানি, তাকে আমি প্রায়ই দেখেছি কাণা-খোঁড়াকে পয়সা দিতে। বন্ধুত্বে তারা ঢের ভদ্রলোকের চেয়েও বড়। যাকে বন্ধু ব'লে জানে, তার জন্যে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দিতে পারে। আবার, যারা বিশ্বাস ক'রে তাদের আশ্রয় নেয়, তাদের পায়ে তারা কুশাঙ্কুর বিঁধ্‌তে দেয় না। আমি কল্‌কাতার যেখানে থাকি, সেখানে গুণ্ডার সংখ্যা অগুন্তি! তাই আমি গুণ্ডাদের চরিত্র উল্টে-পাল্টে অধ্যয়ন করবার সুবিধা পেয়েছি। কোন মানুষেরই সবটা খারাপ নয়।

আমি বিলক্ষণই জানতুম, গুণ্ডারা যখন আনন্দে মেতে আছে, তখন তারা অশান্তির কথা মনেও আনবে না। বিশেষ, আমরা যেচে তাদেরি আশ্রয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করছি—তাদের বিশ্বাস করছি! আমাদের এ নির্ভরতার মর্য্যাদা তারা রাখ্‌বেই রাখ্‌বে। অতএব বন্ধুকে টেনে নিয়ে, একটা বাঁশের বেড়া টপ্‌কে, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে একেবারে আসরের মধ্যে গিয়ে বস্‌লুম।

ভারি অবাক হয়ে তারা আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। এত রাত্রে, আমাদের মত দুটি নিরীহ ভদ্র চেহারা যে অনাহুত হয়ে তাদেরি আসরে গিয়ে বস্‌তে পারে, এটা বোধ হয় তাদের কাছে অসম্ভব বোধ হচ্ছিল! কিন্তু

চারপাশে যথেষ্ট জায়গা ক'রে দিলে! তারপর নাচ-গান-বাজ্‌না আবার অবাধে চল্‌ল—কেউ প্রশ্নও করলে না, আমরা কে, এত রাত্রে কেন এখানে এসেছি! যা ভেবেছিলুম তাই—তাদের চরিত্র আমি ভুল বুঝি নি!

বাইজী দুটি বাঙালী এবং একটিকে দেখ্‌তে-শুন্‌তেও বেশ। গানও গাইছিল ভালো! এদের পছন্দ আছে! নূতন নূতন গানের সঙ্গে তব্‌লা-বাঁয়া দুটো বার বার হাত বদ্‌লে যাচ্ছিল—এখানে বাজিয়ের সংখ্যা তো কম নয়! এরা খালি ছোরা ধরতেই শেখে নি, আর্টেরও চর্চ্চা করেছে দেখ্‌ছি। বাস্তবিক, তারা সকলেই খুব ভালো বাজাচ্ছিল—এতগুলো তৈরি হাত ভদ্রলোকের আসরেও বড়-একটা দেখা যায় না!

বাইজীদের হাব-ভাব দেখে বুঝলুম, এই দলে দলে অপ্রিয়-দর্শন বিদেশী লোকগুলির মধ্যে আমাদের পেয়ে তারাও যেন বেশ খুসি হয়েছে। আমাদের দেখবার আগে তারা এদিকে পিছন ফিরে ছিল, কিন্তু তারপর আমাদের দিকেই মুখোমুখী ক'রে ব'সে গান ধর্‌লে। তারা দুজনেই এক গা গয়না প'রে এসেছে,—বায়নার সময়ে নিশ্চয়ই টের পায়-নি, আজ তাদের বাঘের গর্ত্তে ঢুকতে হবে! মনে মনে অবশ্যই তারা ভয় পেয়েছে—যদিও অকারণে। বাঘরা আজ শুধু খেলতে চায়—গয়নার দিকে তাদের চোখ নেই!

সত্য, এখানকার শ্রোতারা অত্যন্ত সমঝদার! একেবারে শান্তশিষ্টের মতন ব'সে তারা একাগ্রমনে গীত-সুধা পান করছে এবং মাঝে মাঝে যথাস্থানে বাহবা দিচ্ছে। ভদ্রের আসরেও আমি এত সমঝদার শ্রোতা দেখি নি। বাগান-বাড়ীর গানের আসরে দেখেছি, সে কী হুল্লোড়, কী দাপাদাপি—কার সাধ্য সেখানে গান জমায়! সে মাতামাতির আসল কারণ, মদ। কিন্তু এখানে সুরাদেবীর মহিমা না থাক্‌লেও, প্রায় সকলেই যে ভাঙের নেশায় মস্‌গুল হয়ে আছে, শ্রোতাদের মুখ দেখ্‌লেই তা বুঝতে আর দেরি লাগে না।

এখানে খেয়ে যেতে হবে,—এ যে দেখছি জামাই-আদর! অনেক ক'রে তবে তাদের বুঝিয়ে দিলুম, রাত চারটের সময়ে আমাদের খাওয়ার অভ্যাস নেই, আমরা বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি—ইত্যাদি! তারপর আমরা বিদায় নিলুম—কারণ বন্ধুবরের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এত আদর-যত্নেও তাঁর মন প্রবোধ মানছে না—তিনি যেন জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েছেন!… …এই হ'ল গিয়ে আমাদের গুণ্ডার আড্ডায় বাইজীর গান শোনা! সয়তানের রং যে ছবিতে-আঁকার মত অতটা কালো নয়, আশা করি আপনারা এতক্ষণে তা বুঝ্‌তে পেরেছেন!… … …

নবম দৃশ্য

রঙ্গালয়

আগে যাত্রার আসরে আমরা সারা রাত কাটাতুম, এখন সে সময়টা কাটছে থিয়েটারে। শিক্ষিত বাঙালী যাত্রাকে এখন একরকম 'বয়কট' করেছে বল্‌লেই চলে এবং দেশের অগণ্য সখের ও পেশাদার থিয়েটার-গুলোর আওতায় প'ড়ে যাত্রার দল দিনে দিনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যাত্রার অধিকারীরা এখন তাই থিয়েটারের নকল ক'রে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। একেলে "থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি" গুলিই তার প্রমাণ! এতে যাত্রার ঢং বদলে গেছে, অভিনয়ের ধরন বদ্‌লে গেছে, গানের সুর বদ্‌লে গেছে এবং প্রায়ই কল্‌কাতার প্রকাশ্য রঙ্গালয় ভাড়া নিয়ে এ-সব যাত্রার অভিনয় হয়। আসলে এগুলি না যাত্রা, না থিয়েটার!

পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় একটা ছাড়াছাড়ি নির্লিপ্ত ভাব আছে,—সভা ও আসরে সেখানে প্রত্যেকের জন্যেই স্বতন্ত্র আসন না হ'লে চলে না। কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে সর্ব্বত্রই গায়ে-পড়া ভাবটাই প্রধান হয়ে আছে। বাড়ীতে একান্নবর্ত্তী পরিবার সর্ব্বদাই সমস্ত অনৈক্যের সমস্যাকে প্রাণপণে সমাধানের চেষ্টায় বিব্রত এবং বাইরেও সভা ও আসরে সকলেই একাসনে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি ক'রে উপবিষ্ট। কোন্ ব্যবস্থা উপকারী, আমি তা নিয়ে এখানে নাড়াচাড়া করতে রাজি নই; কিন্তু স্মরণ আছে, গ্রীষ্মকালে যাত্রার আসরে আমাদের কী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত! গুমোট্‌-করা রাত্রে সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বিপুল জনতা জড়ো হয়েছে, দর দর ঘামে আমরা আপাদমস্তক ভিজে উঠ্‌ছি, মাথার উপরে 'ফ্যান' তখন কল্পনাতীত, কোনদিকে একচুল নড়বার উপায় নেই—কারণ ডাইনে বাঁয়ে সাম্‌নে পিছনে লোকের পর লোক আমাদের যেন প্রাণপণে চেপে ধ'রে আছে, অনেকের গায়ে বিষম দুর্গন্ধ, অনেকে কনুইয়ের গুঁতো মারছে এবং অনেকে আরো যে কত কি করছে তা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি! এরি মধ্যে, "নিতুই নিতুই রাজবাড়ী ফুল যোগাই কেমন ক'রে" ব'লে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ী-গোঁফঅলা মুখে, কখনো হিজ্‌ড়ের মত হাততালি দিতে দিতে, কখনো হাঁটুর কাপড় একটুখানি তুলে ধ'রে ও কালো কালো কর্কশ পা বার ক'রে ঘুরে-ফিরে নেচে যায়, বিদ্যার মা এসে নাকী-সুরে কান্না ধরে, রাজা ও কোটাল গর্জ্জন ক'রে তড়্‌পাতে থাকে, রুক্ষ পরচুল-পরা পিলে-মোটা কৃষ্ণবর্ণ ছোঁড়াগুলো সখী সেজে অস্বাভাবিক স্বরে গান গেয়ে কাণের পোকা তাড়িয়ে দিয়ে যায়, উকিলের সাজে জুড়ীর দল চার কোণে দাঁড়িয়ে, যেন কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করার ভঙ্গিতে ভীম বিক্রমে বাহু সঞ্চালন ক'রে ও বুক-চমকানো মুখভঙ্গির সঙ্গে পাঁটার

ঝাড়-লণ্ঠনের ম্লান আলোতে অস্পষ্ট ভাবে এই-সব দৃশ্য আমরা শেষ-রাত পর্য্যন্ত ঠায় ব'সে ব'সে নিষ্পলক নেত্রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহবা দিতে ছাড়তুম না! তারপর যাত্রা ভেঙে যেত এবং আমাদের অনেকেই আর জুতো খুঁজে পেতুম না! যখন দেহে-মনে নিস্তেজ হ'য়ে বাড়ীতে ফিরতুম, তখন বোধ হ'ত যেন সারারাত্রব্যাপী মল্লযুদ্ধ ক'রে আসছি! যাত্রা যে খাঁটি দেশী আমি তা জানি, কিন্তু আমাদের বাল্যকালে যা দেখেছি তাতে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেটি একটি মারাত্মক স্বদেশী ব্যাপার! এবং হয়তো এইজন্যেই বিনামূল্যের যাত্রা ছেড়ে লোকে এখন ট্যাঁকের টাকা খরচ ক'রেও থিয়েটার দেখ্‌তেই বেশী ভালোবাসে।

রাতের কল্‌কাতায় থিয়েটার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। কল্‌কাতার বাসিন্দাদের মধ্যে থিয়েটারের* ভক্ত অগুন্তি। এখানে এলে আমাদের জাতীয় বিশেষত্বগুলি চোখ ও কাণের সাম্‌নে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

সাহেবদের দেখাদেখি বাঙালীরা এদেশে থিয়েটারের পত্তন করেছে বটে, কিন্তু বিলাতী থিয়েটারের অধিকাংশ গুণই বাংলা রঙ্গালয়ে দেখা যায় না। বিলাতের কথা ধরি না, কিন্তু আমাদের এই কল্‌কাতারই বিলাতী থিয়েটারগুলিতে (ধরুন, এম্পায়ার থিয়েটার) গেলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। চারতালা প্রকাণ্ড বাড়ী, নীচে থেকে তিনতালার সিঁড়ি পর্য্যন্ত আগাগোড়া মার্ব্বেলে বাঁধানো। কোথাও অতিরিক্ত কারুকার্য্য রসবোধকে আহত করে না, অথচ এক সরল, মার্জ্জিত সৌন্দর্য্যে মনকে মুগ্ধ করে। অত-বড় বাড়ী, নিত্য কত লোক আসা-যাওয়া করছে, তবু সমস্তটাই এতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে, অনুবীক্ষণের সাহায্যেও হয়তো ধূলা-জঞ্জালের কণা আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে! এর তুলনায় বাঙালীরা যে-বাড়ীগুলোতে রাত্রির পর রাত্রি যাপন করে, তাদের অবস্থা যে কি শোচনীয়, সে কথা পরে যথাস্থানে বলবার চেষ্টা করব।

চিহ্ন বাইরে উঁকি মারে না। চারিদিকে কলাসৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা নিয়ে সানন্দে রাত্রিযাপনের জন্যেই দর্শকরা এখানে এসে টাকা খরচ করে এবং বিলাতী রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারীরাও সেটা বুঝে সাঁচ্চা টাকার বদলে ঝুটো মাল দেয় না। এখানকার দৃশ্যপটে কাঁচা-হাতের তুলির টান, ছেলে-ভুলানো বাজে রঙের বাহার, আসাময়িকতা অস্বাভাবিকতা বা অসামঞ্জস্য একেবারেই নেই। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকালেই দেখা যাবে, ছাদের উপর থেকে কুৎসিত কাঠের বা বাঁশের 'ফ্রেম', দড়াদড়ী ও ছেঁড়া ন্যাকড়া উঁকিঝুঁকি মারছে, পার্শ্ব-দৃশ্যের (wings) সঙ্গে সাম্‌নের দৃশ্যপটের মিল নেই, নূতন দৃশ্যপটের সঙ্গে মান্ধাতার আমলে আঁকা, রং-জ্ব'লে-যাওয়া, ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্যপটও গুঁজে দেওয়া হয়েছে রঙ্গমঞ্চের তলায় উলঙ্গ, ধুলোভরা কাঠের তক্তাগুলো দেখা যাচ্ছে এবং অভিনেতাদের পোষাকেও ঠিক এম্‌নি-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি!

অভিনয়েও দেশী-বিলাতীতে এম্‌নি তফাৎ। কল্‌কাতার সাহেবদের রঙ্গালয়ে সাধারণত যারা অভিনয় করে, বিলাতের নট-সমাজে তারা নগণ্য বল্‌লেও চলে। কিন্তু এই নগণ্য অভিনেতারাও আমাদের অগ্রগণ্য অভিনেতা-দের অধিকাংশেরই গুরুস্থানীয় হ'তে পারে। তারা বিলাতে নগণ্য বটে, কিন্তু নাটকীয় রস জমাবার জন্যে তারাও যতটা সাধনা করে, বাঙালী অভিনেতারা স্বপ্নেও বোধ হয় তা করে না। অন্তত তাদের ও আমাদের অভিনয় দেখ্‌লে এই সন্দেহই মনে স্থান পায়। সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা, পাকা ও কাঁচা, প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের মধ্যে যতটা পার্থক্য, তাদের ও আমাদের অভিনয়ের মধ্যেও তফাৎ ঠিক ততখানিই। এর প্রথম কারণ, বিলাতী নটরা প্রথমে অভিনয়-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়, তার পর বহুদিন রঙ্গালয়ে উমেদারী ক'রে অভিজ্ঞতা লাভের পরে তবেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে অভিনেতারা যেন

দেশী রঙ্গালয়ে, রিহার্সালের পরমায়ু এত অল্প যে নিখুঁৎ অভিনয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি জানি, মাত্র দুই তিন দিনের "রিহার্সালে"র পরেই অনেক নাটক প্রকাশ্য ভাবে অভিনীত হয়েছে! কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক্, কারণ আমরা এখানে রঙ্গালয়ের সমালোচনা করতে বসি নি—বাঙালী দর্শকরা রাত জেগে পয়সা নষ্ট ক'রে কি লোক-ঠকানো ব্যাপার দেখতে যায়, সেইটেই বোঝাবার জন্যে প্রসঙ্গসূত্রে দু-একটা ইঙ্গিত দিলুম মাত্র।

আমাদের রঙ্গালয় অনেক ফন্দিবাজ ছোক্‌রার মা-বাপ ঠকানোর উপায় ক'রে দেয়। ছোক্‌রারা প্রথম প্রথম যখন উড়তে শেখে, তখন "থিয়েটার দেখ্‌তে যাচ্ছি" ব'লে গণিকালয়ে যায়। অনেকে কোন গতিকে থিয়েটারের 'প্রোগ্রাম' সংগ্রহ ক'রে রাখে। বাপ মা সন্দেহ প্রকাশ্ করলে নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণিত করবার জন্যে, তারা সেই 'প্রোগ্রাম' দাখিল করে। বেশী রাতে বাড়ী ফিরলেও একমাত্র দোহাই হয়—'থিয়েটারে গিয়েছিলুম'! অধিকাংশ মা-বাপই এম্‌নি সুবোধ যে, সেই দোহাই শুনেই তুষ্ট হন। আসলে তাঁদের উচিত স্পষ্টভাষায় ব'লে দেওয়া যে, অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া ছেলেরা মোটেই থিয়েটার দেখতে যেতে পাবে না। তা হ'লেই এরা জব্দ হবে। এই প্রথম অবস্থায় যুবকরা ভীরু থাকে। এ সময়ে বাধা দিলেই অনেকের স্বভাব সুধ্‌রানোর সময় থাকে। পরে গণিকালয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত হ'লে তাদের বুক ব'লে যায়। তখন তাদের আর ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

অনেকে মেয়েদের রক্ষী হ'য়ে থিয়েটার দেখতে আসে। মেয়েদের উপরে পাঠিয়ে তারা থিয়েটার থেকে স'রে পড়ে। তার পর বাইরে বাইরে ফূর্ত্তিতে খানিকক্ষণ কাটিয়ে, পালা শেষ হবার কিছু আগে তারা আবার থিয়েটারে ফিরে এসে মেয়েদের নিয়ে বাড়ী যায়। অথচ ইতিমধ্যে ভিতরে

কিন্তু সময়ে সময়ে এই অতি-চালাকরাও হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে যায়। থিয়েটার ভেঙে গেল, সব মেয়ে একে একে নেমে গেল, কিন্তু এক বাড়ীর মেয়েরা হয়তো চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তখনো অপেক্ষা করছেন! কারণ, কর্ত্তার দেখা নেই! ক্রমে রাত গভীরতর হোলো, মেয়েরাও ভয়ে কান্না সুরু করলেন! কর্ত্তা হয়তো তখন কোথায় ব'সে নিশ্চিন্তপ্রাণে খেম্‌টা নাচ উপভোগ করছেন! হয়তো ইয়ারদের অনুরোধ না এড়াতে পেরে দু-পাত্র টেনে সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন! তারপর হঠাৎ ঘড়ীতে রাত তিনটের ঘা শুনে যখন তাঁর সাড় হয়... ... ...

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই আর একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। রাত্রির কলঙ্ক-কাহিনী সর্ব্বত্রই রেখে-ঢেকে বল্‌তে গেলে আমাদের বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে!... ...সকলে মনে রাখবেন, নীচের গল্পটির আগা-গোড়া সত্য। কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকার নাম দুটি কাল্পনিক।

অমলা বিধবা, রূপসী, যুবতী,—একেলে উপন্যাসে আদর্শ নায়িকা হবার মত কোন গুণেই সে বঞ্চিত নয়।

যুবতী বিধবার জীবন এদেশে 'ট্রাজেডী' ব'লেই শুনি। অমলার জীবনও তাই হ'তে পারত, পাশের বাড়ীর যতীশচন্দ্র কিন্তু অমলাকে সে চরম দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করলে, অবশ্য পরম গোপনে। কথাটা বোধ হয়, আর ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না।

অমলা যে ঘরে শোয়, তার পাশেই একটি খুব সরু গলি। তার পরেই যতীশের বাড়ী। দু-জনে রোজই দেখা হয়—দুই ঘরের দুই জান্‌লা থেকে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। অমলার বাড়ীর লোক বড় সজাগ, তারা প্রেমের কদর বোঝে না।

কিন্তু বাড়ীর লোকেদের চেয়ে মদনঠাকুরের বুদ্ধি ও শক্তি ঢের বেশী। তাঁর মহিমায় দুর্ভেদ্য কাঁটা-বনেও সকলের অগোচরে রাস্তা তৈরি হয়।

একটি সুতোয় বেঁধে যতীশ একদিন অমলার ঘরে একখানা চিঠি ঝুলিয়ে দিলে—উপরের ছাদ থেকে। অমলা তা পড়্‌লে। চিঠিতে কি ছিল, জানি না। অমলা কিন্তু চিঠি প'ড়ে, একটু হেসে, ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—আচ্ছা।

অমলার বাড়ীর লোকেরা প্রায়ই থিয়েটার দেখতে যায়—পাসে, কি টিকিট কিনে, বল্‌তে পারি না। চিঠি পাবার পর দিনেই অমলা থিয়েটার দেখতে গেল—দেওরের সঙ্গে একলা। তার দেওরও থিয়েটারের একান্ত ভক্ত। তার সঙ্গে প্রায়ই সে একলা থিয়েটার দেখতে যায়—সব দিন বাড়ীর আর সকলের যাওয়া হ'য়ে ওঠে না।... ...অমলাকে উপরে পাঠিয়ে অমলার দেওর টিকিট কিনে ভিতরে ঢুক্‌ল।

থিয়েটারের পালা সুরু হয়েছে, এমন সময়ে ঝি এসে অমলাকে বল্‌লে, "অমুক রাস্তার অমুক বাবু তোমাকে ডাকচেন।" ঝি, অমলার দেওরের নাম করলে।

অমলা নেমে এসে দেখে, রাস্তায় একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে,—ভিতরে যতীশ। বিনাবাক্যব্যয়ে সে গাড়ীতে এসে উঠল।... ... ...ঘণ্টা-দুই নানা রাস্তায় ঘুরে গাড়ী আবার থিয়েটারের দরজায় এসে দাঁড়াল। অমলা আবার থিয়েটারের উপরে গিয়ে উঠল।... ... ...

থিয়েটারে এই ধরণের আরো অনেক ঘটনা যে ঘটে না, এমন কথা জোর ক'রে কে বল্‌তে পারে? আমরা আরো অনেক কাণাঘুষা শুনেছি, কিন্তু তার সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করতে পারব না ব'লে, এখানে আর সেগুলির উল্লেখ করলুম না। এ-সব ব্যাপারের সঙ্গে থিয়েটারের ঝিয়েরা জড়িত থাকে কি না, বল্‌তে পারি না। অন্তত তার কোন প্রমাণ পাইনি।

এমন-সব ব্যভিচারের জন্যে থিয়েটারকেও দায়ী করা সঙ্গত নয়। থিয়েটার উঠিয়ে দিলেও এ পাপের অভিনয় বন্ধ হবে না, অন্য পথে আত্ম-

রঙ্গালয় হচ্ছে ললিতকলার ত্রিবেণী-সঙ্গম। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র-কলার মধ্যে উপভোগ্য যা-কিছু, রঙ্গালয়ে তারই একত্র সমাবেশ থাকবার কথা। চোখ কাণ, ও মন এখানে এসে মোহিত না হ'য়ে আহত হ'লে বুঝব, রঙ্গালয় তার আদর্শ বজায় রাখতে পারে নি। কিন্তু বাংলা থিয়েটারে গেলে চোখ, কাণ আর মনের অবস্থা যে কি-রকম হয়, এইবারে সেইটেই দেখা যাক্।

প্রথমত, বাংলা থিয়েটারের বাহিরের দৃশ্য। কলা-মন্দিরের বাহিরটা জম্‌কালো হওয়া উচিত এবং আমাদের রঙ্গালয়ের মালিকরাও সে কথা বোঝেন। ষ্টার ও অধুনালুপ্ত মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারগুলিতে তাই স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল। ষ্টার থিয়েটার সত্যসত্যই কল্‌কাতার মধ্যে একটি দেখতে-চমৎকার বাড়ী, তার দেহে বিশেষ একটি শ্রী-ছাঁদ আছে। কিন্তু এমন সুন্দর বাড়ীও মালিকদের রসবোধের অভাবে এবং সওদাগরী বুদ্ধির প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিকে যার-পর-নাই আহত করে। থিয়েটারের গায়ে বা সীমানার মধ্যে পাণ বিঁড়ির কুৎসিত দোকান বাঁধ্‌তে দেওয়া হয় কেন? সামান্য গোটাকয়েক টাকা ভাড়ার জন্যে, এত যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে প্রস্তুত প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির শ্রী-সৌন্দর্য্যকে মলিন করা অন্যায়, অতি অন্যায়। মাড়োয়ারীর পক্ষে এ কাজ সাজে, কিন্তু ললিত কলায় আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বাঙালীর পক্ষে এটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

তার পর বাংলা থিয়েটারের ভিতর-অংশ। এখানকার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব, ধুলো, ময়লা, জঞ্জাল, কালি-ঝুল, পাণের পিক্ ও অসহ দুর্গন্ধ। আশেপাশে, নীচে-উপরে যেখানে চোখ পড়ে, সেইখানেই মালিকের অবহেলা ও একটা-না-একটা নোংরা দাগ দেখা যায়ই যায়। দেয়ালে,

বাজার থেকে, কারণ তার মধ্যে কলা-নিপুণতা ও একটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা 'ষ্টাইল' কোথাও নজরে পড়ে না। তাতে রঙের পরে রঙের ছোব্ আছে, হরেকরকমের লতা-পাতা-ফুল আছে, ডানা-ছড়ানো পরী ও নগ্ন নারীর মূর্ত্তি আছে এবং আরো ঢের হিজিবিজি আছে, কিন্তু তাদের আদর্শ যে কি, তা বোঝবার কোনই উপায় নেই। কোথাও দেখি অজন্তার আদর্শ, আবার কোথাও দেখি মিসরী বা মোগল বা বিলাতী বা শিল্পীর নিজস্ব 'আদর্শ'হীন আদর্শ! হাটখোলার দর্শকরা হয়তো ভালো-মন্দ না বুঝে এই আর্টের নীরব প্রলাপের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে হাঁ-ক'রে তাকিয়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু বাংলা থিয়েটারের দর্শক তো খালি হাটখোলা থেকে আসে না! তাদের রুচিকে যে এখানে গলা টিপে বধ করা হয়! দুঃখের কথা বল্‌ব কি, শিক্ষিত ও রসজ্ঞদের দ্বারা চালিত কোন থিয়েটারেও আমাদের কথার প্রমাণ অজস্র। থিয়েটারে ঢুক্‌লে শিক্ষিতদেরও রুচি এম্‌নি বিগড়ে যায় নাকি?

বাংলা থিয়েটারের আর এক বিশেষত্ব—দর্শকদের গোলমাল। এত গোলমাল "নতুন বাজারে"ও হয় না। অভিনয়ের সময়েও মাঝে মাঝে দর্শকরা এম্‌নি চাঁচাতে থাকে যে, অভিনয় বন্ধ করতে হয়। প্রত্যেক অঙ্কের পরে বিশ্রামের সময়ে সেই গোলযোগ আবার অশ্রান্তভাবে ত্রিগুণ বর্দ্ধিত হ'য়ে কর্ণকে বধির ক'রে দেয়। কর্ত্তৃপক্ষরা থিয়েটারের ভিতরে পানওয়ালাদের ঢুকতে দেন যে কোন্ আক্কেলে, তা তাঁরাই জানেন। সে এক বিষম আপদ তারা ক্রমাগত গায়ের উপর দিয়ে সকলের পা মাড়িয়ে ছুটোছুটি করবে, "পাণ-সিগারেট" ব'লে হুঙ্কার দেবে এবং রগ ঘেঁষে সোডার বোতল রেখে দুম্ দুম্ ক'রে খুলবে! কি অস্বস্তি! অধিকাংশ থিয়েটারেই "কন্‌সার্ট" নামে যে নিষ্ঠুর ব্যাপারটি আছে, তাকেও যান্ত্রিক কোলাহল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কাণের কাছে ঢাকের বাদ্যিও বোধ হয় এর চেয়ে মিষ্টি! এ-সবের তুলনায় সাহেবী থিয়েটারগুলি শান্তির স্বর্গ বল্‌লেও চলে। সেখানকার

তারপর আসনের বন্দোবস্ত। সাহেবী থিয়েটারের মত (বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটার ছাড়া) এখানে মাঝখান দিয়ে আসা-যাওয়ার পথ বা প্রত্যেক দুই সার আসনের মাঝখানে যথাসম্ভব ব্যবধান নেই। ফলে একজন লোক গেলে বা এলে এক সারের সমস্ত লোকের অবস্থা হয়ে ওঠে ভীষণ শোচনীয়। তার উপরে প্রত্যেক আসনই এতদূর নোংরা, কদর্য্য ও ছারপোকা-ভরা যে, হঠযোগের অভ্যাস না থাকলে নিশ্চিন্ত প্রাণে ব'সে ব'সে দীর্ঘকাল ধ'রে অভিনয়ের রস উপভোগ করা একান্ত অসম্ভব।

এই ভয়ানক জায়গায় গিয়ে আমরা রাত্রির পর রাত্রি ধ'রে যখন অভিনয় দেখ্‌তে কসুর করি না, তখন আমরা যে প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রিয় জাতি, তাতে আর সন্দেহ কি? এমন দিন গেছে, যখন বেলা দুটো থেকে সুরু ক'রে পরদিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অভিনয় হয়েছে এবং তা দেখেও আমাদের পৈত্রিক প্রাণ দস্তুরমত জীবিত আছে! বিলাতী আইনে আত্মহত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। কাজেই আইনানুসারে এখন নিয়ম হয়েছে যে, এমন সাংঘাতিক অভিনয় দেখে বাঙালীরা আর আত্মহত্যা করতে পারবে না। রাত একটার পরে অভিনয় এখন নিষিদ্ধ। কিন্তু সে আইন যে মানা হয়, তা বল্‌তে পারি না। সরকার এজন্যে ইনস্পেক্টর নিযুক্ত ক'রেছেন বটে, কিন্তু বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের উৎসাহ এখনো প্রায় রাত আড়াইটে তিনটের আগে শান্ত হয় না! এর মানে কি? তার পর, বাঙালী দর্শকদেরও মতি-গতি এখনো এইদিকেই ঝুঁকে আছে। তাই থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষরাও পালে-পার্ব্বনে বা বিশেষ অনুমতি নিয়ে যখনি সুবিধা পান, সারারাত্রব্যাপী অভিনয়ের আয়োজন করেন এবং দর্শকরাও অম্‌নি কাতারে কাতারে থিয়েটারের দিকে সবেগে ধাবিত হন!

অভিনয়-কালে বাংলা থিয়েটারের সাধারণ দৃশ্য কম-বেশী পরিমাণে এই রকম :—

ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়। পালা সুরু হবার কথা সন্ধ্যা সাতটায়, কিন্তু বেজেছে আটটা। হয়তো আরো দেরি হ'ত, কিন্তু 'পিট' ও 'গ্যালারি'র দর্শকদের ঘন ঘন শীষ ও হাততালিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কর্ত্তৃপক্ষরা শেষটা যবনিকা তুলতে বাধ্য হ'লেন। প্রথম দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল, বিশ-পঁচিশটি সখী—বয়স দশ থেকে পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত —নানা ভঙ্গীতে শুয়ে ব'সে বা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের মুখ রঙে ও পাউডারে অসম্ভবরূপে লাল ও সাদা, হাত-পাও তাই। কিন্তু প্রত্যেকের মাথার পিছনদিকে খোঁপার তলায় ঘাড়ের উপর থেকে আসল রং দেখা যাচ্ছে—কারণ আরসিতে চোখে পড়ে না ব'লে সেখানটা আর 'পেণ্ট' করা হয় নি! সখীদের মধ্যে অধিকাংশই হয় লিক্‌লিকে রোগা, নয় থপ্‌থপে মোটা,—একজনেরও মুখশ্রী ও গড়ন ভালো নয়, বেশীর ভাগেরই চোখ বসা ও কুৎকুতে, নাক খ্যাঁদা ও গাল ভিতরপানে ঢোকা! নেপথ্য থেকে বাঁশী, পিয়ানো, হার্মোনিয়াম ও তবলা বাজ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে এই 'লাইট' ও 'হেভি-ওয়েটে'র দল প্রাণপণে না-দেশী না-বিলাতী নাচ ও গান সুরু ক'রে দিলে, তাদের দাপাদাপি লাফালাফির চোটে 'ষ্টেজে'র উপর থেকে যুগান্তরের পুঞ্জীভূত ধূলারাশি জেগে উঠে, হু হু ক'রে উড়ে প্রথম কয়েক সারের দর্শকদের ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করলে, দর্শকরা হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো ক'রে হেঁচে ও থক্ থক্ ক'রে কেশে নাকের ছ্যাঁদায় খুব জোরে রুমাল বা কোঁচার খুট চেপে রইল। নেচে-গেয়ে বেদম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সখীরা চ'লে যেতে উদ্যত হোলো, পিছনের দর্শকরা অম্‌নি তারস্বরে চেঁচিয়ে এবং হাততালি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"এঙ্কোর! এঙ্কোর!" কিন্তু সাম্‌নে থেকে ধূলিধূসরিত দর্শকরা বল্‌তে লাগ্‌ল—"নো মোর! নো মোর!" খানিকক্ষণ ধ'রে 'এঙ্কোরে' ও 'নো মোরে' এম্‌নি প্রবল যুদ্ধ চল্‌ল—ততক্ষণে একটু হাঁপ ছেড়ে জিরিয়ে নিয়ে সখীরা আবার রঙ্গমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হ'য়ে

ভিতর থেকে অশ্লীল বা হাস্যোদ্দীপক কতরকমের শব্দই যে আস্‌তে লাগ্‌ল তার সব আর বল্‌বার নয়, গোটাকতক নমুনা দিচ্ছি :—"ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা!"—"লে হালুয়া!"—"ম'রে যাই, মরে যাই!—"ও হোঃ হোঃ!"—"প্রাণ যে যায় রে বাপ্!"—"যাস নে ভাই, আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যা!" প্রভৃতি।

রঙ্গালয়ের একেবারে প্রথম সারে কতকগুলি লক্কা-পায়রার মানবীয় সংস্করণের মত ছোক্‌রা ব'সে আছে। তাদের অধিকাংশেরই মাথার নীচের দিকের চুল খুব-সম্ভব ক্রপের ক্ষুর দিয়ে কামানো এবং সাম্‌নের দিকে ঝুঁটিওয়ালা টেড়ী—একেবারে দাগী চেহারার লক্ষণ! তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ভুর ভুর ক'রে 'মধু'র গন্ধ বেরুচ্ছে এবং কারুর কারুর চুড়ীদার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে 'ফ্লাস্কে'র মুখ উঁকি মার্‌ছে! তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি এক একটি বিশেষ নর্ত্তকীর ভাবভঙ্গির দিকে আবদ্ধ, নর্ত্তকীরাও প্রায় প্রত্যেকেই নাচ্‌তে নাচ্‌তে এক-একটি বিশেষ লক্কা-পায়রার দিকে বারংবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে!……বুঝতে দেরি লাগে না যে, এরা পরস্পরের পরিচিত। থিয়েটার ভাঙ্‌লেই স্থানান্তরে 'গিয়ে এদের মিলন হবে!

উপরে 'বক্স', সেখানকার দৃশ্যও বিচিত্র। কোন বক্সে একদল বাবু ব'সে আছেন। তাঁদের কেউ কেউ 'গার্ড'কে ডেকে, তার হাতে দুটো-একটা টাকা গুঁজে দিয়ে চুপি চুপি খোঁজ নিচ্ছেন, অমুক অমুক সখীর ঠিকানা কি, তারা বাঁধা আছে কিনা প্রভৃতি। একটি চশ্‌মা-পরা ছাগল-দাড়ী বাবু মোটেই থিয়েটার দেখছেন না, তিনি একদৃষ্টিতে তিনতালার মেয়েদের আসনের দিকে তাকিয়ে সমানে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

পরের 'বক্সে' একদল মাড়োয়াড়ী কল্‌কাতার একটি সেরা ও বিখ্যাত "সৌন্দর্য্য"কে নিয়ে ব'সে, অনেক সখের বাঙালীবাবুর হিংসা ও বিরাগ ভরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কেউ কেউ উচ্চস্বরে তাদের শুনিয়ে দিতেও ত্রুটি

গ্যালারী

করছে না যে, "এই ব্যাটা ছাতুখোর মেড়োদের উৎপাতে সেরা সেরা বিবি লোপাট হয়ে গেল দেখ্‌চি!" সে গালাগালি শুনেও মাড়োয়াড়ীরা কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করছে না, বরং গর্ব্বপূর্ণ অবহেলায় হাসি হাসছে!

তার পরের বিছানাওয়ালা 'বক্সে' দুই বাবু, দুই বিবি। এক বাবু অত্যধিক সুধাপান ক'রে বিবির কোলে মাথা রেখে কাৎ হয়েছেন, বিবি তাঁর মাথায় আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় বাবু এক গেলাস মদ নিয়ে দ্বিতীয় বিবিকে কাকুতি-মিনতি করছেন।

বিবি হাত দিয়ে বাবুর গেলাস-ধরা হাত সরিয়ে বল্‌ছেন, "মর্ মুখপোড়া! এই বাজারে ব'সে সকলের সাম্‌নে মদ খাব কি রে?"

বাবু বলছেন, "খাবিনি? তাহ'লে আমি আত্মহত্যা কর্‌ব!"

ঠিক তার পরের 'বক্সেই' চারজন ভদ্র মহিলা পাশেই মাতাল দেখে আর এই-সব কথা শুনে ভয়ে এক-গা ঘেমে, একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছেন!

ইতিমধ্যে নুরজাহান ও সের খাঁ প্রেমালাপ কর্‌তে কর্‌তে রঙ্গমঞ্চের উপরে এসে আবির্ভূত হলেন। নুরজাহানের চেহারা দেখেই থিয়েটার-শুদ্ধ লোক প্রকাশ্য তারস্বরে একটা নিরাশা-ভরা অব্যক্ত ধ্বনি ক'রে উঠল। সত্য, নিরাশ হবার কথাই বটে! এই কি সেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতুলনীয়া সুন্দরী নুরজাহানের মূর্ত্তি? গড়ের মাঠের চেয়ে সামান্য ছোট কপাল, টিয়াপাখীর মত নাক, দুই গণ্ডের মাংস নিম্নদিকে লম্বিত, আকর্ণবিশ্রান্ত বদন-বিবর, ভাঁজ-করা চিবুক, দোদুল্যমান ভুঁড়ি, নরহস্তিনীর মত দেহ—কি ভয়ানক, নুরজাহানের 'ক্যারিকেচার'ও যে এর চেয়ে দেখ্‌তে সুন্দর! রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও আশ্চর্য্য সাহসকে ধন্যবাদ! গ্যালারির একজন দর্শক তো আর থাক্‌তে না পেরে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "এ নুরজাহানের ঠিকানা কি বাবা! মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীটের স্যাওড়াতলা?"

চিফ্‌-গার্ড "এইও! চোপ্‌!" ব'লে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে,

গ্যালারির চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত ক'রে বারংবার বল্‌তে লাগ্‌ল "কে বল্‌লে এ কথা ? কে বল্‌লে এ কথা ?"

কিন্তু আর-সমস্ত দর্শকের হাস্য ও ব্যঙ্গ ধ্বনির মধ্যে 'চিফ্ গার্ডে'র কণ্ঠস্বর অসহায় ভাবে কোথায় তলিয়ে গেল !

ইতিমধ্যে একজন দর্শক একমুখ পাণ নিয়ে হ্যাচ্চো ক'রে প্রচণ্ড এক হাঁচি হাঁচ্‌লে— সঙ্গে সঙ্গে তার সাম্‌নের দর্শকের মাথা, ঘাড়, চাদর ও জামা নিরেট পাণ-সুপারিতে ও পাণের পিকে বিচিত্র হয়ে গেল ! নিজের অবস্থার দিকে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত নেত্রে নীরবে তাকিয়ে থেকে, দ্বিতীয় দর্শক তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "এটা কি হোলো শুনি ?"

১ম দর্শক। (গম্ভীর ভাবে মুখ মুছতে মুছতে) হেঁচে ফেলেচি, কি আর হবে ?

২য় দর্শক। (সক্রোধে) কি হবে, দেখবে রাস্কেল ?

১ম দর্শক। (দাঁড়িয়ে) কী, মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌চি !

২য় দর্শক। তুমি হাঁচি সাম্‌লাতে পারলে না, আমি মুখ সাম্‌লে কথা কইব, ষ্টুপিড ?

১ম দর্শক। (ঘুসি পাকিয়ে) ফের গালাগাল ?

২য় দর্শক। (১ম দর্শকের মুখে হঠাৎ এক ঘুসি মেরে) ড্যাম, শুয়োর-গাধা !

গার্ডেরা ছুটে এসে দুজনকেই ধ'রে বাইরে টেনে নিয়ে গেল—সেখান থেকে তাদের অশ্রান্ত হুঙ্কার শোনা যেতে লাগ্‌ল !

এতক্ষণ পরে অভিনয়ের প্রথম সুযোগ পেয়ে সের খাঁয়ের সঙ্গে নুরজাহান প্রেমালাপ সুরু কর্‌লেন। কিন্তু দু চারটে কথা বল্‌তে না বল্‌তেই উপরের মেয়েদের আসন থেকে কার কোলের শিশু বিশ্রী তীক্ষ্ণ স্বরে

নীচে থেকে পুরুষ দর্শকরা সচীৎকারে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওগো, ছেলে থামাও, ছেলে থামাও!"

নূরজাহান ও সের খাঁ হতাশভাবে উপরিদিকে চেয়ে, বোবা কাঠের পুতুলের মতন রঙ্গমঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিশুর কান্না ক্রমেই উঁচু-পর্দ্দায় উঠতে লাগ্‌ল। নীচে থেকেই শোনা গেল, আর একটি মেয়ে বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "এ তো ভ্যালা জ্বালা রে বাপু! ছেলেকে থামাও না গো!"

ছেলের মা বললে, "আমি কি ছেলেকে চিম্‌টি কেটে কাঁদাচ্চি? থাম্‌চে না, কি কর্‌ব বল বাছা!"

—"কি আর করবে, বাইরে গিয়ে থামিয়ে এস!"

—"ঈশ্‌, বাইরে বেরিয়ে যাব! কেন, আমি কি টাকা দিয়ে থিয়েটারে আসি-নি?"

তার পরেই মেয়েলি ঝগড়ার পালা আরম্ভ! সঙ্গে সঙ্গে ওদিকেও আবার এক নূতন ব্যাপার! একটা 'বক্সে'র দর্শকদের সর্ব্বাঙ্গে মেয়েদের আসনের তলা থেকে খানিকটা সন্দেহকর দুর্গন্ধ জল ছড়্‌ ছড়্‌ ক'রে পড়তে লাগল—নিশ্চয় আর এক শিশুর কীর্ত্তি! সেখানেও আর এক নূতন গোলমালের সৃষ্টি! ... ... অতঃপর থিয়েটারের অভিনয় হ'তে থাক্‌ল দর্শকদের আসনের দিকে এবং দর্শকে পরিণত হ'লেন সের খাঁ ও নূরজাহান! ... ...

আসুন, ইতিমধ্যে আমরা একবার রঙ্গমঞ্চের অন্দরে উঁকি মেরে আসি! বাইরের অধিকাংশ দর্শকের কাছেই রঙ্গমঞ্চের অন্দর হচ্ছে রহস্যময় স্বর্গপুরীর মত—যেখানে দলে দলে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা বিচরণ করছেন! এ স্বর্গের মধ্যে একবারমাত্র প্রবেশের অধিকার পেলে অনেকেই বোধ হয় আনন্দের আবেগে পাগল হ'য়ে যেতে পারে! আসুন, আজ আমি

কিন্তু ভিতরে ঢুক্‌লে অনেকেরই সুখ-স্বপ্ন বাস্তবের কঠোর আঘাতে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে, এ কথা আগে থাকতেই ব'লে রাখা ভালো।

অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চের ভিতরে পা দিলেই প্রথমে দৃষ্টিকে আহত করবে, একটা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল গুদাম-ঘরের মত নীরস, নিরানন্দ দৃশ্য! এখানে পাশাপাশি অগণ্য দৃশ্যহীন দৃশ্যপট সাজানো রয়েছে, ওখানে রাশি রাশি দড়া-দড়ী ঝুলছে, কোথাও গাদা গাদা ন্যাকড়া, পোষাক স্তূপীকৃত হয়ে আছে, কোথাও হরেক-রকম টুকিটাকি জিনিষের উপর দিয়ে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর ছুটোছুটি করছে! চারিদিকেই একান্ত সঙ্কীর্ণ অলিগলি, তারই মধ্যে দলে দলে লোক এ ওকে ধাক্কা মেরে আস্‌ছে আর যাচ্ছে, মুক্ত আলো আর বাতাসের সেখানে প্রবেশ নিষেধ—দু মিনিট দাঁড়ালেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, তার উপরে সিগারেট, তামাক, রং, শিরীষের আঠা, ঘর্ম্মাক্ত পোষাক ও স্যাঁৎসাতানির একটা মিশ্র দুর্গন্ধে গা যেন বমি-বমি করতে থাকে। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে মোটেই স্বর্গের আভাস পাওয়া যায় না!

আশপাশে ছোট ছোট কুঠারী, সেগুলি 'স্বর্গে'র অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর বাসিন্দাদের জন্যে। আর একদিকে দুটো বড় ঘর। তাদের মধ্যে আল্‌না ও দড়ীতে নানারঙের অগুন্তি পোষাক-পরিচ্ছদ ঝুল্‌ছে। প্রত্যেক ঘরের দেয়ালের গায়ে এক-একখানা বড় আয়না। ঘরের ভিতরে বহু ব্যবহারে বার্ণিসহীন কতকগুলো টেবিল। তাদের উপরে রং, রঙের পাত্র, আর্সি, চিরুণী, বুরুস, পাউডার, রুজ, ভুরু টান্‌বার কালির 'ষ্টিক্‌,' পরচুলো, কৃত্রিম দাড়ী-গোঁফ, আধ-পোড়া সিগারেট, খাবারের টুক্‌রো, জলের গেলাস ও কাণা-ভাঙা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি হরেক রকম জিনিষ এলমেল ভাবে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে, এদিকে-ওদিকে খানকতক টুল বা পিছন-ভাঙা চেয়ার, ঘরের মেঝেতে দেশী-বিলাতী নানান রকম জুতো, ঘরের কোণে

নয়, দেয়ালে টাঙানো ঢাল ও পিতলের ঘুঙুর, এম্‌নি কত আর নাম কর্‌ব! এ দুটো ঘর হচ্ছে সাধারণ সাজঘর—একটা পুরুষদের ও একটা স্ত্রীলোকদের জন্যে।

রঙ্গমঞ্চের একপাশে খানিকটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গা, সেখানেও কতকগুলো ভাঙা চেয়ার ও বেঞ্চি সাজানো রয়েছে। তার উপরে ব'সে আছে কয়েকজন পুরুষ ও নারী, অধিকাংশেরই মুখে রং মাখা ও পরোনে নানা-ধরনের সাজসজ্জা। মাঝখানে একখানা ইজি-চেয়ারে থিয়েটারের ম্যানেজার অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে গম্ভীর মুখে তামাক টানছেন। একপাশে মেঝেতে ব'সে একজন অভিনেতা নগ্নদেহে কেবল মাত্র ইজের পরে, থিয়েটারের বাঁধা-নাপিতের কাছে দাড়ী কামাচ্চে। এটি হচ্ছে ম্যানেজারের সভা। এ সভায় সর্ব্বদাই চক্রান্ত চল্‌ছে, একে অপরের নামে লাগাচ্ছে এবং সভাপতির নামে চাটুবাদ হচ্ছে। থিয়েটারের মত নীচতা, হীনতা ও ষড়যন্ত্রের স্থান বাংলাদেশে খুব কমই আছে। এবং এখানকার জীবগুলি যে কত সহজে ও অকারণে সত্যের অপলাপ ক'রতে পারে তা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়! ... ...

রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে নূরজাহান বিরক্ত মুখে ফিরে এসে বল্লেন; "আজ্‌কের 'অডিয়েন্স' বড় খারাপ! খালি গোলমাল করচে, আমাকে 'ক্ল্যাপ' দিলে না!"

বেঞ্চির উপরে মিস্‌ কিরণ ব'সে একহাতে ঠোঙা নিয়ে, ডানহাতে ক'রে একখানা হিঙের কচুরি খাচ্ছিল। সে 'নূরজাহানে'র চেয়ে সুন্দরী এবং তার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে, নূরজাহানের ভূমিকাটি নিয়ে সে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু ম্যানেজারের পক্ষপাতিতায় তার সে আশায় ছাই পড়েছে। 'নূরজাহান' যে আজ রঙ্গমঞ্চে গিয়ে সুখ্যাতি পায়নি, মিস্‌ কিরণ এতে ভারি খুসি হয়েছে। এখন নূরজাহানের নিরাশার কথা শুনে ও বিরক্তির ভাব দেখে সে মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

নট-নটীদের উপরে ম্যানেজারের প্রভুত্ব যে কি প্রচণ্ড, বাইরের লোক সে খবর রাখে না। ম্যানেজারের ইচ্ছা এখানে নেপোলিয়নের মত অবাধ। তিনি খুসি থাকলে অযোগ্যও 'পার্ট' পাবে, তিনি চট্‌লে যোগ্যের যোগ্যতাও কোন কাজে লাগবে না। ম্যানেজারেরা প্রায়ই তাঁদের প্রভুত্বের অসদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন। আমি জনৈক ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজারকে জানি, অন্তত একবারও যাঁর শয্যাসঙ্গিনী না হ'লে কোন অভিনেত্রীর 'পার্ট' পাবার আশা থাকত না। এ-রকম আরো কত লোক থিয়েটারে আছে, কে তা জানে!

'নূরজাহান'ও হয়তো এম্‌নি কোন গুপ্ত উপায়ে জনসাধারণের সাম্‌নে আবির্ভূত হবার সুযোগ পেয়েছে। তাই মিস্‌ কিরণের হাসি আজ আর নূরজাহানের সহ্য হোলো না, রেগে গস্‌ গস্‌ কর্‌তে কর্‌তে সে সাজঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌ল এবং একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে ব'সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেল্‌লে!

ওদিকে এককোণে ঐ যে স্ত্রীলোকটি আর্সির সাম্‌নে ব'সে, মুখে রং মাখবার উপক্রম কর্‌ছে, ওকে চেনেন কি? ওর কোকিলের মত রং, টাক-পড়া মাথা, বসন্তের ছর্‌রা-মারা মুখ ও বাঁখারির মত হাত-পা দেখে শিউরে উঠ্‌বেন না—কারণ ও হচ্ছে সেই "কোকিলকণ্ঠী পরমাসুন্দরী" গায়িকা বিনোদিনী, সহুরে বাবুরা ও মাড়োয়াড়ীর দল যার বাড়ীর ঠিকানা পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে আছে! একটু সবুর করুন, তাহ'লেই দেখ্‌বেন সাজঘরের অপূর্ব্ব মহিমায় ওর চেহারা তিলোত্তমার মতই লোভনীয় হয়ে উঠেছে!

থিয়েটারী সৌন্দর্য্যমাত্রই এই জাতীয়। নিখুঁৎ রূপ এখানে তো নেইই, এমন-কি চলনসই সুন্দরী পর্য্যন্ত এখানে থাকে না—থাক্‌তে পারে না। কারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে কালে-ভদ্রে একজন রূপসীর আবির্ভাব ঘট্‌লেই, দর্শকদের মধ্য থেকে নিশ্চিতরূপে তার রূপের পূজারী বা কাপ্তেন একাধিক সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে এবং দুদিন পরেই সে রূপসীর আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। খোঁজ নিলে জানা যাবে, সে এখন অমুক বাবুর 'বাঁধা',

আর থিয়েটার কর্‌বে না! কাজেই এই রঙ্গ-বিশ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘর-বাড়ী-সহর, সাজ-পোষাক ও আসবাব-পত্তরের মত মানুষগুলির সৌন্দর্য্যও একান্ত কৃত্রিম এবং রঙ্গমঞ্চ ছাড়া ত্রিভুবনের আর কোথাও তাদের সার্থকতা নেই। অতএব যাঁরা সন্দেহ করেন যে এই তথাকথিত স্বর্গের মধ্যে যথার্থই উর্ব্বশী, মেনকা ও রম্ভা প্রভৃতি বাসা বেঁধে আছেন, আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, তাঁদের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক!

একদল সখী নাচ্‌তে নাচ্‌তে 'উইংসে'র ভিতর দিয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য অংশের দিকে যাচ্ছে। 'উইংসে'র ভিতরেই একটি লোক ব'সে হার্ম্মোনিয়াম বাজাচ্ছে এবং প্রত্যেক সখী যেই তার কাছ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সে অম্‌নি মৃদুস্বরে তার সঙ্গে রসিকতা ক'রে নিচ্ছে!

হাস্যরসাবতার মোনাবাবু আর একজোড়া 'উইংসে'র মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট রূপসীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কইছেন, তার নাম 'বোঁচাখুকী'। এই বোঁচাখুকীর উপরে মোনাবাবুর সুনজর অনেক দিন থেকেই আছে—কিন্তু বোঁচাখুকী কিছুতেই তাঁকে আমল দিতে রাজি নয়! সৌভাগ্যক্রমে আজ্‌কের নাটকে মোনাবাবু পেয়েছেন স্বামীর ও বোঁচাখুকী পেয়েছে স্ত্রীর ভূমিকা। মোনাবাবু তাই আজ বোঁচাখুকীকে নির্জ্জনে টেনে নিয়ে বোঝাতে প্রবৃত্ত হয়েচেন, যে, তোমাতে আমাতে আজ এই যে সম্পর্ক হোলো, এবার থেকে এই সম্পর্কই যেন বরাবর বজায় থাকে!

বোঁচাখুকী চোখ মট্‌কে বল্‌লে, "আ ম'রে যাই! আমার কাছে কেন, বাজারে কি দড়ী-কল্‌সি জোটে না?" ... ...

আর এক প্রান্তে একদল যুবক—অধিকাংশেরই চেহারা অগাখেকো বগাখেকো—ব'সে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সমান চেহারার পাঁচ দশ পনেরো টাকা মাইনের সখীর সঙ্গে গোপনে হাসি-মস্করা করছে এবং মাঝে মাঝে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখছে, ম্যানেজারের নজর তাদের উপরে আছে কিনা! এরা হচ্চে 'অ্যাপ্রেন্টিসে'র দল। এরা মাইনে পায় না, অনেকের

পাবার আশাও নেই। রঙ্গমঞ্চের নির্ব্বাক জনতার দৃশ্যে কিংবা রণক্ষেত্রের কাটা-সৈনিকের ভূমিকায় এরা আবির্ভূত হয়—পেটে এদের বোমা মারলেও "ক" অক্ষর নির্গত হওয়া অসম্ভব! মাইনে না পেলেও, সখীদের সঙ্গে লুকিয়ে ফষ্টিনষ্টি করবার নিষিদ্ধ অধিকার পেয়েই এই জীবগুলি তুষ্ট হয়ে থাকে—যদিও এদের অবস্থা এখানে অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ এখানকার টিকটিকিগুলো পর্য্যন্ত এদের উপরে চোখ রাঙিয়ে তম্বি করতে ছাড়ে না!

রঙ্গমঞ্চের ভিতরের 'ফোটো' আমরা দিলুম, এ দেখে কি আপনাদের স্বর্গ ব'লে ভ্রম হচ্ছে? এখানে বলবার কথা আরো অনেক আছে, কিন্তু আপাতত এই নমুনা দেখেই সকলে তুষ্ট থাকুন।

বাইরে, রঙ্গালয়ের দর্শকরা তখন দীর্ঘকাল চীৎকার ও গোলমাল ক'রে শ্রান্ত ও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। রঙ্গমঞ্চের উপরে নূরজাহান, জাহাঙ্গীর ও সভাসদরা বারংবার আনাগোনা করছেন, কিন্তু কেউ আর কিছুমাত্র আপত্তি বা উৎসাহ প্রকাশ করছে না। কোন কোন দর্শক চেয়ারে ব'সে আছে বটে, কিন্তু তার নাসিকা সঙ্গীত-যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এক একজন ঘুমন্ত দর্শকের মাথা তার পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকের কাঁধের উপরে লুটিয়ে আছে। পাশের দর্শক বিরক্ত হয়ে যত বেশী সরে যাচ্ছে, ঘুমন্ত লোকটির মাথাও তত বেশী লুটিয়ে পড়ছে! ...... কেবলমাত্র 'পিট' ও 'গ্যালারি'র দর্শকেরা তখনো একেবারে মুসড়ে পড়েনি! সখীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তারা চঞ্চল ও মুখর হয়ে উঠ্‌ছে! নট-নটীরা যখন জমাতে পারলে না, তখন দর্শকরাই শীষ ও হাততালির সঙ্গে টিপ্পনি কেটে আসর না রাখলে আর উপায় কি? সাধারণত বাংলা থিয়েটারী বিজ্ঞাপনে যে গ্র্যাণ্ড 'সাক্সেসে'র কথা পড়া যায়, সেই 'সাক্সেস' আসে নট-নটীর পক্ষ থেকে নয়, ঐ 'গ্যালারী'র অন্ধকূপের গর্ভ থেকেই! থিয়েটারের লক্ষ্মী বাস করেন ঐ গ্যালারীর মধ্যে—যেখানে 'ফ্রিপাশের' উপদ্রব নেই।

যবনিকা